এখন ডুয়ার্স

১ জানুয়ারি ২০১৬। ১২ টাকা

নতুন বছরের শুভেচ্ছা
এখন থেকে পাক্ষিক

চায়ের কাপে চোখের জল

শ্রমিকের মৃত্যু
দায়ী অনাহার নাকি ভগবান ?

কমলালেবু উৎপাদন
নাগপুরে সফল হলে ডুয়ার্সে নয় কেন ?

চা বাগান থেকে নারী পাচার
অভিভাবকের অনুমোদনেই

ডুয়ার্সের ঘাসফুল জমিতে
বেনো জলের সংক্রমণ
শুরু মুকুলের হাতেই

শুরু হল ধারাবাহিক
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি
লাল চন্দন নীল ছবি

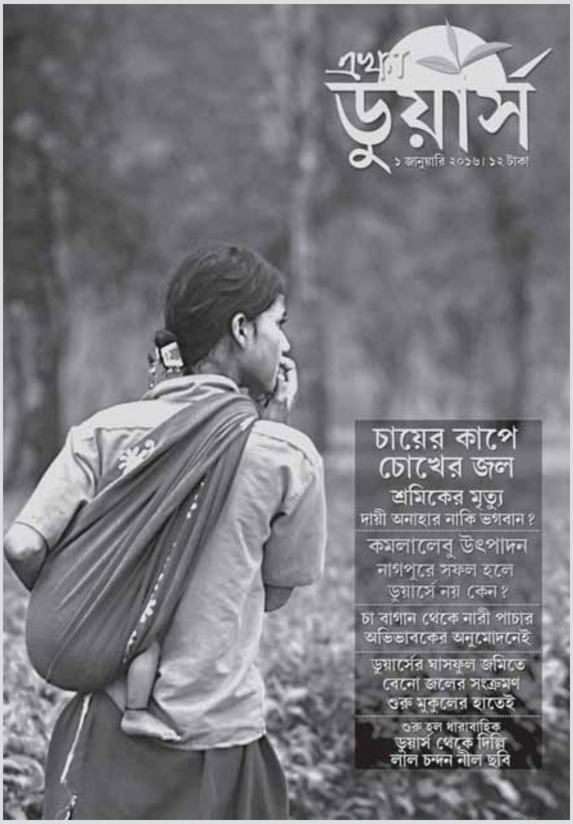

চোখের সামনে চায়ের পাতা, চায়ের সমুদ্দুর
শীত-কুয়াশায় তেমনি ভেজা, পাতায় ভাসে সুর
চায়ের পাতায় জীবন গেঁথে এলাম এতদূর
এক নিমেষে সেসব ছবি নিতান্ত ভাঙচুর?

চোখের সামনে সবুজ ভাসে, ঝাপসা হয়ে যায়
অনাহারের তীব্র থাবা এখন আমার গা-য়
চোখ গিয়েছে শূন্যে ভেসে, কে নেবে কার দায়?
রুগ্ন আঙুল বুঝতে শেখে জীবন অসহায়!

পিঠের ঝোলায় নেতিয়ে পড়ে শীর্ণ ভাবিকাল
আমার শরীর নীল হয়ে যায়—জীবন বেসামাল
আমার শিশু এই বাগানেই হাঁটবে জানি কাল
তার জন্যে থাকবে শুধু চায়ের মরা ডাল?

ভাবনাগুলো উগড়ে ওঠে, কামড়ে ধরি ঠোঁট
আমার দুঃখ বিক্রি করে আসবে জানি ভোট!

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে গৌতমেন্দু রায়

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১ জানুয়ারি ২০১৬

এই সংখ্যায়

এখন ডুয়ার্স
সবুজ ডুয়ার্সের মাটিতে কমলাসুন্দরীর ঠাঁই নেই! ৮

দুরবিন
ঘাসফুল জমিতে বেনো জলের সংক্রমণ ঘটেছিল মুকুলের হাতেই ২২

চায়ের কাপে চোখের জল
চা-বাগানের হাহাকারকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আত্মহত্যাকে আহ্বান ১১
শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল কি সবটাই ভগবানের হাতে? ১৬

ধারাবাহিক
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৯
তরাই উৎরাই ২৬
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ৩০
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২

পর্যটনের ডুয়ার্স
খোঁড়া পায়ে বক্সা পাহাড় ২৪

ডুয়ার্সের গল্প
জলরঙের দুপুর ৩৫

শ্রীমতী ডুয়ার্স
বয়সকালে বাত শীতে আরও কাত? ৪২
অনলাইন কেনাকাটা নিরাপত্তার টুকিটাকি ৪২
পাঁক থেকে তুলে আনা কুঁড়ি যেখানে ফুল হয়ে ফোটে ৪৬

স্পেশাল ডুয়ার্স
যাদের কথা কোনও রিপোর্টে নেই ৩৮

নিয়মিত বিভাগ
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৭
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৪
ডুয়ার্সের মুখ ৪৭
সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৯
প্রহেলিকা ৩১

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
ডুয়ার্সে নিজস্ব প্রতিনিধি পিনাকী মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বিশ্বাস, বরুণ সাহা, শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের নতুন অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

স্বাগতম ২০১৬

নতুন বছরে জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রতিজ্ঞা

১২ মাস, ৩৬৫ দিন, ২৪ ঘন্টা পুরবাসীর সঙ্গে আছি

JANUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNE

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

AUGUST

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTOBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

NOVEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

হস্তি মোটেই মূর্খ নয়

এ কথা সবাই জানে যে অরণ্যে নির্দিষ্ট পথ বেয়ে হাতিবাহিনী চলাফেরা করে। পথগুলোকে বলে হাতির করিডোর। অলপ্পেয়ে দোপেয়েরা করিডোর দখল করে নিলে হাতিরা কেমন প্রতিশোধ নেয় তা ডুয়ার্সের মানুষমাত্র জানেন। আম দোপেয়ে না হয় করিডোর জেনেও চাষবাস করে আর মাঝে মাঝে হাতিরা ফসল খেয়ে কর আদায় করে। কিন্তু সরকার বাহাদুর বেমক্কা করিডোরে কলেজ বানায় কেন? বানারহাটে যে হিন্দি কলেজ ঢোল পিটিয়ে তৈরি হচ্ছে, তা যে হাতিদের করিডোরের জমিতে, সে কথা একবারও ভাবলে না তো মন্ত্রী থেকে বনপাল! এই যে সেদিন গোটা পঞ্চাশেক হাতি কলেজ কেমন চলছে সেটা ভীড় করে দেখতে এসেছিল, এর অর্থ কী? আগামী শিক্ষাবর্ষে তাঁরা যে ভরতি হতে আসবে না, ক্লাসে বসতে আসবে না, রোল কলে অংশ নেবে না, প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করবে না— তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? এমনিতেই দোপেয়েরা 'হস্তিমূর্খ' বিশেষণ বানিয়ে তাদের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ করেছে। এবার করিডোরে কলেজ পেয়ে আসাম থেকে নেপাল যাওয়ার

shantiniketan

The abode of peace, stretches its boundaries

An 8.33 acre Township

PHASE 1: 21 BLOCKS / 730 FLATS

PHASE 2: 04 BLOCKS / 114 FLATS (EXTENSION)

Phase 1 occupancy Started

FACILITIES & AMENITIES

Landscaped Garden	Badminton Court	Ample Car parking
Morning Walk Trails	Community Hall	Convenience Store
Jogger's Park	Swimming Pool	Festival Podium
Adda Zone	Play School	Rainwater Harvesting
Gymnasium	Library	24X7 Security
Indoor Games	Kala Kendra	Power Back-up

Book 1,2,3 BHK
at a Booking price of ₹10,000*

Project developed by
AJAY BEGRAJ
a unit of Begraj Group

Marketed By
DHFL
Property Services Ltd.
Dreams do come true

Site Address:
Near North Bengal Medical College
Sushrutanagar, Siliguri

Call: 9735037000/ 9735038000
Email: shantiniketansiliguri@gmail.com

পথে যদি গজকূল একটু শিক্ষা নিয়ে (মানে, দিয়ে) যেতে চায়, তবে আগাম ক্ষতিপূরণ কত হবে তা বলে দাও বাপু! এমনি এমনি প্রাণ খোয়াতে বানারহাট হিন্দি কলেজে ভরতি হতে যাব না কো!

পেটে না খেলে মরে কিসে

ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের একটি দুটি করে মৃত্যুর খবর বছরভর ভেসে ওঠে মিডিয়ার মায়া দর্পণে। অনাহারে মরে যাওয়ার কথা কি ক্ষমতাবানেরা স্বীকার করতে চায়? তাই জানা যায়, মৃত্যুর কারণ অনাহার নয়, ডাক্তারি মতে জানা যাচ্ছে মরেছে পিলে চমকে, অথবা হৃদ দৌর্বল্যে কিংবা ফুসফুস বিগড়ে কিংবা...।

বন্ধ বাগানের শ্রমিক খায় কী? আদতে যা খায় তা আমি আপনি খেলে তিনদিনেই আধমড়া হয়ে যাব। অবশ্যি মাঝে মাঝে ত্রাণ আসে। দশ দিন সিকি পেটা অখাদ্য খেলে দু'দিন ত্রাণের সুখাদ্যে কতটা পুষ্টি হয়? হায়! মানুষ যে সাত দিনের খাদ্য একদিনে গ্রহণ করে এক হপ্তা উপোস থাকতে পারে নাকো! অপুষ্টির শরীরে রোগ আসে আর মোটামুটি বিনে চিকিৎসায় রোগীকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে সে রোগ যায়।

কাজেই মৃত্যুর জন্য অনাহার দায়ী নয়। অনাহার তো হয়-ই না। কী করে হবে? চাল তো পাচ্ছে মাথা পিছু দু'কিলো হপ্তায়!! সে চাল গোরু রিফিউজ করতে পারে, কিন্তু ওদের রিফিউজ করার কী আছে? চাল খাওয়া যায় না ব্যাপারটা পলিটিক্যাল হিংসে! খাতায় কলমে যাচ্ছে ফাইন চাল আর আপনারা দেখছেন পোকা ভর্তি?

ঠিক। ঠিক। অনাহারে চা-শ্রমিকের মৃত্যু একটা বাজে প্রচার। এত যে সত্যজিৎ রায় বলতে অজ্ঞান হয়ে যান, আর এটা জানেন না উনি কী বলেছিলেন? শুনে নিন, 'অনাহারে নাহি খেদ/ বেশি খেলে বাড়ে মেদ।'

সুতরাং না খেয়ে কেউ মরছে না!

বাঘরিক!

কিছু কিছু জিজ্ঞাসা চির রহস্যময়। যেমন ঈশ্বর কি আছেন? ডুয়ার্সেও আছে একটা এমন মহা জিজ্ঞাসা। তা হল— বক্সায় কি বাঘ আছে? সেখানে কি ব্যাঘ্রহীন প্রকল্প? বক্সার ব্যাঘ্রকূল কি ভার্চুয়াল? বাঘেরা কি ভূতপূর্ব সেখানে? রোমানদের ভাষায়— বাঘ নেই তা বলছি না, তার মানে কিন্তু এই নয় যে আছে।

চিতার কথা যদি বলো, তবে তারা মাঝে মধ্যে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে নিজেকে আর লোকজনদের ঝামেলায় ফেলে। চা-বাগানের কোনায় চিতার ছানা পাওয়া কোনও বিস্ময়কর কাহিনি নয়। বনবেড়াল তো আছেই। কিন্তু যাকে বলে শার্দুল মানে সেই আসলি বাঘের খোঁজখবর ডুয়ার্সে শেষ কে পেয়েছে? কে দেখেছে? কে শুনেছে শেষ 'হালুম' সেখানে?

এত কথার কারণ, বক্সার জঙ্গলে নাকি উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা বসিয়েও বাঘের ছবি তোলা যায় নি! অবশ্য এটাও হতে পারে যে বড় বেড়ালের দল ভুটানের 'বাঘরিক' হয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সে সবই হয়। জানতি পারো না!

শীত বুড়ি ফর্মে

ডিসেম্বরের গোড়াতেও ডুয়ার্সে শীতের তেমন দেখা মিলছিল না। দেশের দক্ষিণে প্রবল বৃষ্টি আর প্রলয়ঙ্কর বন্যার ধাক্কায় শীতের হাওয়ার মাথা আউলা হয়ে যাওয়ায় দিনের বেলায় রোদ্দুরে দাঁড়ালে গা জ্বলে যাচ্ছিল ডুয়ার্সবাসীর। অবশেষে বাক্স-প্যাটরা নিয়ে তাঁর আগমন ঘটল। তাঁর, মানে শীতবুড়ির। ডিসেম্বরের পয়লা রবিবার ভোরবেলায় কুয়াশায় চাদর দিয়ে ডুয়ার্সকে ঢেকে দিয়ে ঝপ করে তাপমান নামিয়ে দিল সাত-আট ডিগ্রি।

শীতকালে শীত এলেই ডুয়ার্সের মন খুশি। অবশ্যি কুয়াশায় গাড়ি ঘোড়া ট্রেন বাস গতি হারিয়ে কিছুটা খাবি খায়। বাগডোগরায় বিমানের ওঠা-নামা প্রায় শূন্যতে গিয়ে ঠেকে মাঝে মাঝে। হাতির দল রেললাইন পাড় হতে গিয়ে চাপাও পড়ে। কিন্তু এ তো ফি বছর ডুয়ার্সের শীতের সাইড এফেক্ট! এর জন্য কি শীতপালন বন্ধ থাকতে পারে? এ লেখা যখন পড়ছেন, তখন ডুয়ার্সে বাকি বঙ্গের মতোই পৌষ মাস। বেলুনে সাজানো রাশি রাশি গাড়ি ছুটির দিনগুলোতে দৌড়চ্ছে পিকনিকে। ডুয়ার্সের অনেক টুরিস্ট স্পট যে আদতে পিকনিকপ্রেমীদের আবিষ্কার, সেকথা কে না জানে?

শীতবুড়ি ডুয়ার্সের ইনিংসে ফর্ম ফিরে পেলেও কুয়াশাভেজা এই পৌষ মাসে কিন্তু সর্বনাশও আছে। সে সর্বনাশ রেলে কাটা হাতির ছানার, কুয়াশায় দিগভ্রান্ত ট্রাক ড্রাইভারের, দশ ঘণ্টা লেটে চলা দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি শীতবস্ত্রহীন অভাগাদের তো বটেই! আরও একটা প্রচ্ছন্ন সর্বনাশ নিয়েও চিন্তিত কেউ কেউ। ডুয়ার্সে মাঝ পৌষে যে তিন-চারদিন ঝড় বৃষ্টি হত সে দিনগুলি এক দশকের বেশি হল মিলিয়ে আছে। এ কি তবে সবুজ ডুয়ার্সকে নগর বানানোর প্রতিশোধ?

কার্টুন ঃ সি শুভ্রম

হারিয়ে গেল গাছের ছায়ায় এক চিলতে রোদ

ভোরবেলা। তখনও রাত্তিরের ঘুম ভাঙেনি। শীত মেখে চা-বাগান জড়সড়! পাতার উপর জমা শিশির টুপটাপ ঝরছে। গাছের পায়ের কাছে ঝরে পড়া পাতায় সেই শিশিরের অদ্ভুত মায়াবী শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ। চমকে দেওয়া। ছায়াগাছেরা শেষ রাতে কেমন ভূতুড়ে হয়ে যায়।

নতুন চা-বাগানে যোগ দেওয়া তরুণ আকস্মিক জেগে ওঠে। কীসের শব্দ। ঠুং-ঠাং... টং-টং... ঢং-ঢং...। মনে হচ্ছে অনেক কাঁসরঘণ্টা একসঙ্গে বেজে উঠছে যেন। আড়মোড়া ভেঙে হঠাৎই একটি পাখি ডেকে উঠল। তারপর একে একে আর-একটি, তারপর আরও একটি, একে একে আরও...। শব্দগুলোর মিশ্রণ এক অন্য মেলোডি তৈরি করতে লাগল।

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

কীসের আওয়াজ! কেন আওয়াজ! অন্ধকারে উঠে বসে ছেলেটি। সদ্য পুববাংলা থেকে এসেছে। পদ্মার ঘ্রাণ এখনও টাটকা শরীরে। জল-মাটির সারল্যও। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ির দিকে তাকানো। উহ্, কী ঠান্ডা! একেই ডুয়ার্স বলে? ক'টা বাজে? না, যত রাত ভেবেছিল তা নয়। রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে আসছে। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। ওর কাছে অবশ্য মধ্যরাতই। বাইরে আওয়াজ চলছেই। মাঝে মাঝে কিছু মানবীর কণ্ঠস্বর। পুরুষ-কণ্ঠও। কী ঘটছে কে জানে! কৌতূহল আর উদ্‌বেগ মিলেমিশে একাকার।

দরজা খুলে বাইরে এল সে। হাতে শক্ত করে ধরা টর্চ লাইট। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করল শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে। চা-বাগানের সাধারণ কোয়ার্টার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ওদিকটায় শ্রমিক-লাইন। কুলিকামিনদের ঘর। তারপর কিছুটা উঁচু মাটির টিপি। তারপরেই... সবুজ সবুজ সবুজ। এত সবুজ বাংলাদেশেও সে দেখেনি। ঢেউ খেলানো সবুজের সমুদ্দুর। শ্রমিক-মহল্লার সামনেই একটি টিউবওয়েল।

শব্দ ওখান থেকেই আসছে। চা-বাগানের প্রথম রাত শেষে সে এগল সেই টিউবওয়েলের দিকে। ঠান্ডায় জমে যাবার দশা। কিন্তু কী কাণ্ড! সারা মহল্লা যেন নেমে এসেছে টিউবওয়েলের সামনে। থালা, বাসন, হাঁড়ি, কড়াই ধুয়ে নেবার মহাকাণ্ড চলেছে। কুয়াশার মধ্যে জ্বলছে হ্যারিকেন আর কুপি।

সে দেখে আর দেখে। এত ভোরে এত কাজ! কী তাড়া সকলের। ঠান্ডাও মনে হচ্ছে ওদের মালুম হচ্ছে না। একজন প্রবীণাকে শুধাল, 'কী হচ্ছে এখানে?'

জানা গেল, এ এদের প্রতিদিনের রুটিন। ছ'টা থেকে পাতা তোলার কাজ শুরু। বাগানের ডিউটি। তার আগে রান্না-খাওয়া সারতে হবে। কারও কারও বাচ্চার খাবার তৈরি করে নিতে হবে। নিজেদের টিফিন নিতে হবে। ফিরতে ফিরতে তো বিকেল গড়িয়ে যাবে। বাড়িতে বাড়িতে উনুন জ্বলল। ফরেস্টের লকড়ি জ্বলে উঠল। রান্নার গন্ধে গন্ধে রাত ক্রমে ফরসা হতে লাগল। কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল উনুনের ধোঁয়া।

ভাত খাওয়া হল। গরম গরম ভাত। ভাতের সঙ্গে সামান্য কিছু। শরীর গরম হয়ে উঠল। একটা কাচের বয়ামে আতপ চাল জলে ভিজিয়ে নেওয়া হল। কেন, কে জানে! কারও কারও পিঠের পুঁটুলিতে বাচ্চাটি বাঁধা হল।

পৌনে ছ'টা। চা-বাগানের পথে চেনা ছবি। ওরা ওদের চেনা ছন্দে চলেছে চেনা পথে। গায়ে ভোরবেলাকার রোদের খুনসুটি। সাদরিতে পরস্পরের খবরাখবর লেনদেন। ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষা করছেন বাবুরা। তারপর কাজ আর কাজ। চা-গাছের সঙ্গে লেগে থাকা শরীরী সময়।

বেলা সাড়ে এগারোটায় অবসর। প্রথম দিনের কাজে খুব তাড়া ছিল না তার। সে এসে দাঁড়াল বাগানের রাস্তায়। যে ছাতাটা এতক্ষণ মাথায় ছিল, সেটার ভিতর কাচের বয়াম থেকে ভেজানো আতপ চাল জলসহ ঢালা হল। জল পড়ে গেলে নরম চালে নুন মিশিয়ে তারা টিফিন সারল কী তৃপ্তিতে। সে দেখছে আর ভাবছে— কত সহজ জীবন, কী নিবিড় সরলরেখায় আঁকা!

টিফিন শেষে ঘাসের উপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া। অল্প সময়ের জন্য কারও কারও চোখের পাতায় ঘুম নামল। আবার নির্দিষ্ট সময়ে সকলের ছুটি বাগানেই। একটি কুঁড়ি দু'টি পাতায় গাঁথা জীবনসমূহ।

সারাদিন শ্রমিক-মহল্লা শুনশান; চুপচাপ। কোনও আওয়াজ নেই। শুধু পাখিরা ডাকছে, গোরুগুলো বনবাদাড়ে চলে গিয়েছে। বিকেল গড়িয়ে ফিরবে। গোরু চরানোর লোক আছে। শ্রমিক-বাড়ির উঠোনে অলসভাবে দিন কাটায় রোদ। একা-একা। সন্ধে নামার আগে ওরা ফিরছে। কী হনহন করে করে হাঁটা সকলের। বাড়ি ফিরবার যে কত তাড়া থাকে— চা-বাগানে না এলে বিশ্বাস করা যায় না! বাড়ি তো বাড়িই। হোক না ভাঙাচোরা।

আবার উনুন জ্বলে। আবার ধোঁয়া। উনুনের আঁচ ডেকে নিয়ে আসে গাঢ় সন্ধেকে। সাড়ে সাতটার মধ্যে মধ্যরাত নামে শ্রমিক-মহল্লায়।

ব্রজবাবু বলছিলেন তাসাটি বাগানের কথা। দোসরা ডিসেম্বর পনেরোয় তিনি একাশি পেরলেন। আমি তাঁর সঙ্গে তাসাটি ভোরে চলে গিয়েছিলাম। গয়েরকাটা বাগানের বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। ডিসেম্বরের শীত-হাওয়া কাঁপিয়ে যাচ্ছিল দু'জনকেই। ৩১ নং জাতীয় সড়ক বড় হচ্ছে। রাস্তার পাশের শতবর্ষের গাছগুলো খুন হয়েছে উন্নয়নের চাপে। রাস্তা দখল করে নিচ্ছে চা-বাগানের খেলার মাঠ। তাঁর চোখে ধোঁয়াশা। চুপচাপ বসে থাকেন অন্ধকারে শূন্যের দিকে তাকিয়ে। স্ত্রী কর্কটরোগে চলে গিয়েছেন। দুই ছেলেও অকালে চলে গিয়েছে। অখণ্ড একা তিনি। বুকের ভেতর তাসাটি-মোগলকাটা-গয়েরকাটা। কত বছর আগেকার।

ঘড়ি এগোয় সন্ধে সাতটার দিকে। আলোয় আলোয় চা-বাগান কোয়ার্টারগুলো ঝলমল করছে। শ্রমিক-লাইনেও বিদ্যুৎ-আলো। স্টিরিয়োফোনিক সাউন্ড সিস্টেম বাজছে শ্রমিক-আবাস থেকে, চড়া সুরে হিন্দি ফিল্মি গান। রান্না বসেছে? মনে হয়, না। ভোরেও আর কলতলায় বাসন মাজার লাইন পড়ে না। ভোর ছ'টার কড়াকড়ি নেই। এখন সকাল আটটা। ধীরেসুস্থে সকাল আসে। বয়ামে জলে ভেজানো আতপ চালও বিলুপ্ত। এখন জাঙ্ক ফুড চলে এসেছে টিফিনে! হাড়িয়াকে হার মানিয়ে জম্পেশ আসর জমিয়েছে ভুটানি বা দেশি। রাস্তায় চোখ যাচ্ছে বারবার। হইহল্লায় গয়েরকাটার দিক থেকে ফিরছে বা গয়েরকাটার দিকে যাচ্ছে নতুন সময়। পোশাকে পশ্চিম! চলনে-বলনেও।

বুবু বলল, 'ওই দেখুন, ওই মেয়ে দুটো লিভ-ইন করছে। একজন তো মুসলিম ছেলের সঙ্গে। কাজ শেষে এখন তার ঘরেই যাচ্ছে। বিয়ের কথা বললে বলে, কেন? বিয়ে কেন? ওর সঙ্গেই গোটা জীবন কাটাতে হবে এমন কোনও দায় আছে নাকি? এখন ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে বেশি দিন লাগবে না। যখন পোষাবে না, ছেড়ে দেব।'

পথিক বর

ছ'টা থেকে পাতা তোলার কাজ শুরু। বাগানের ডিউটি। তার আগে রান্না-খাওয়া সারতে হবে। কারও কারও বাচ্চার খাবার তৈরি করে নিতে হবে। নিজেদের টিফিন নিতে হবে। ফিরতে ফিরতে তো বিকেল গড়িয়ে যাবে। বাড়িতে বাড়িতে উনুন জ্বলল। ফরেস্টের লকড়ি জ্বলে উঠল। রান্নার গন্ধে রাত ক্রমে ফরসা হতে লাগল। কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল উনুনের ধোঁয়া।

সবুজ ডুয়ার্সের মাটিতে কমলাসুন্দরীর ঠাঁই নেই !

সাতলা, নারং যে নামেই ডাকো, তিনি কমলা। ডিসেম্বরের শেষে ভালই শীত পড়ে গিয়েছে। বিকেল থেকেই কনকনে একটা হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই শীতের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পিঠে রোদ লাগিয়ে কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে গল্প করার মজাই আলাদা। এই মজা অন্য ফলে পাওয়া যায় না। দুর্গা পুজোর পর থেকেই দেখি সবুজ রঙের কাঁচা কাঁচা কমলা বাজারে আসতে শুরু করেছে। ডুয়ার্সে এই ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে যে কমলা পাওয়া যায়, তা ভুটানেরই মূলত, কিছু দার্জিলিঙের। অবশ্য নাগপুরের কমলাও বাজারে রাশি রাশি দেখা যায়। অখাদ্য !

ছোটবেলায় খুব ভোরে উঠে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতাম কমলা পাকার সময়ে। ত্রিপলে ঢাকা ট্রাক বোঝাই কমলা ভুটান থেকে শিলিগুড়ির দিকে চলে যেত। আমরা ট্রাক দেখলেই হাত নাড়তাম। ট্রাকের পিছনে বসা কুলিরা দু'-চারখানা কমলা আমাদের দিকে ছুড়ে দিত। এইভাবে দিন পনেরো-কুড়িটা কমলা জোগাড় হত আমাদের। এখন অবশ্য এ জিনিস অসম্ভব।

তখন দেখতাম নেপালি-ভুটিয়া পুরুষ আর মহিলা পিঠে ডোকো বোঝাই করে কমলা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায়, হাটে-বাজারে-বস্তিতে বিক্রি করতে আসছে। চল্লিশ বছর আগে ডুয়ার্সে পথঘাট মোটেই ভাল ছিল না। যানবাহনও চলত খুব অল্প। ভুটানের কমলাই ছিল আমাদের সম্বল। দার্জিলিঙের

কমলা ডুয়ার্সের চাহিদা মেটাতে পারত না। এখনও পারে না। তবে তখনও যে কোনও কমলা বাগানে ঢুকে গাছে থেকে দু'-চারটে ফল ছিঁড়ে খাওয়া যেত। এখন তো ছোঁয়ারও জো নেই। কমলালেবু এখন প্যাকিং বাক্সে বন্দি হয়ে ট্রাকে ওঠে। কমলা বোঝাই ট্রাকের দিকে তাকিয়ে কোনও বাচ্চা হাত নাড়লে দুটো-একটা ছুড়ে দেওয়ার দিন হারিয়ে গেছে ডুয়ার্স থেকে।

ডুয়ার্সে কমলা চাষ কেন হয় না, তা নিয়ে বড় বিস্ময় লাগে। এখানে উদ্যোগ নিয়ে কমলা চাষ করলে কেবল ফলই নয়, তা থেকে জ্যাম, জেলি, মার্মালেড, স্কোয়াশ— এসব তৈরি করার ব্যবসাও হতে পারত। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল অনেক। ডুয়ার্সের জ্যাম-জেলির চাহিদার একটা বড় অংশ তো ভুটানের কারখানাগুলিই মিটিয়ে থাকে। চাষ না হলেও ডুয়ার্সের আনাচকানাচে অনেক বাড়িতেই দু'-একটা কমলালেবুর গাছ পাওয়া যাবে। আমার আপিসের কলিগ লাড্ডু সিং-এর গড়গড়িয়ার বাড়িতে চারখানা কমলা গাছ আছে। গত মরশুমে আপিসসুদ্ধু কলিগদের দুটো করে লেবু উপহার দিয়েছিল। মাঝারি সাইজের লেবুগুলি ছিল দিব্যি খেতে। ছোটবেলায় দেখেছি ডুয়ার্সের বহু বাড়িতে আট-দশটা করে মৌমাছির বাক্স থাকত। সে মাছি চাষ হত মধুর জন্য। কমলা ফুল ফুটলেই মৌমাছির দল অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফুলের মধু সংগ্রহ করে আনত আর বাক্সের চারপাশটা ম-ম করত কমলালেবুর গন্ধ। এখনও অনেকে মৌমাছি চাষ করেন।

মাদারিহাটে কমলার বাগান শুরু হয়েছে বলে শুনেছি। দেখা হয়নি। ফলন নাকি বেশ হচ্ছে আর জাতটাও ভাল। সরেস আর মিষ্টি। রামসাইতেও হচ্ছে শুনলাম। অর্থাৎ ডুয়ার্সে দেরিতে হলেও কমলা চাষ নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

শৌখিনতার খাতিরে টবে কমলা চাষের উদাহরণ অবশ্য অনেক চোখে পড়ে। বাড়ির ছাদে বা উঠোনে-বারান্দায় টবের মধ্যে ছোট কমলা গাছ আর সে গাছ বোঝাই পাতিলেবুর সাইজের কমলালেবু জলপাইগুড়ির অনেক বাড়িতেই দেখি। সে কমলা অবশ্য দেখার জন্য। স্বাদে ভয়ানক! নাগপুরের চালানি কমলা কয়েক বছর হল ডুয়ার্সে প্রচুর আসছে।

এবার নাগপুরি কমলার ট্র্যাজেডি বলি। বছর তিনেক আগে বীরভূমে বেড়াতে যাওয়ার আগে ভাবলাম কমলা নিয়ে যাব। বাজার থেকে দেড় ডজন নাগপুরি কমলা কিনেছি। তার সাইজ হাতের তালুতে ধরে না। উজ্জ্বল গেরুয়া রং। দাম মোটে ছত্রিশ টাকা ডজন! দেড় ডজন চুয়ান্ন টাকার বদলে পঞ্চাশ নিল। সে কমলা দেখে তো গিন্নির মুখে হাসি আর ধরে না। হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ধরে কমলা নিয়ে চললাম বীরভূম। এনজেপি'তে ট্রেন ঢোকার পর আমার মেয়ে আর ভাইঝি দুটো কমলা নিয়ে খোসা ছাড়াতে শুরু করল। কিন্তু এ কী! কমলার খোসা কোয়াসুদ্ধু উঠে আসছে। হাত একেবারে রসে মাখামাখি! ওরা একটা কোয়া মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, 'এ মা! কেমন জানি!' এবার আমি চেখে দেখলাম যাচ্ছেতাইরকম পানসে! ভাইঝি বলল, 'টক হলেও খাওয়া যেত! এটা কী জঘন্য স্বাদ!'

এর পর গিন্নির প্রচুর গঞ্জনা নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। বাকি লেবু আবার তুলে রাখলাম। গিন্নি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলল, 'খবরদার! এ কমলা বিয়েবাড়িতে কাউকে দেবে না!' 'না না! গোরুকে দেব।' ইত্যাদি বলে আমি আশ্বস্ত করলাম তাঁকে।

পরদিন বিয়েবাড়ি সেরে গ্রামের পথে বার হলাম কমলাগুলো গামছায় বেঁধে। খানিকটা হেঁটে দেখি ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলছে। মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে

সখিন রায়

গামছার বাঁধন আলগা করে দিতেই কমলাগুলো পড়ে গেল। তা দেখে মাঠ থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'বাস রে! কত্ত বড় কমলা!' আমি আপশোসের অভিনয় করে বললাম, 'সব পড়ে গেল রে!'

'এড্ডা কমলা দাও না কাকু!' ছেলেটি বলল। ততক্ষণে বাকিরা চলে এসেছে। আমি বললাম, 'তোকে একা দিলে তো হবে না! এতজন রয়েছে। তোরা বরং কমলাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যা।'

বলেই হনহন করে হাঁটা দিলাম। প্রায় ছোটার ভঙ্গিতেই প্রাণপণে হাঁটা। খানিকটা যেতেই কানে এল ছেলেগুলোর সমবেত কাতর স্বর— 'কাকু! ও কাকু!' নির্ঘাত কমলা খেয়ে ডাকছিল ওরা! আমি আর দাঁড়াইনি। সোজা বিয়েবাড়ি ফিরে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ভুলেও আর নাগপুরি কমলা নয়। দেখতে দারুণ, কিন্তু ও কমলা আসলে মাকাল ফল।

এবার সখিন রায়ের আশ্চর্য কমলা গাছের কথা বলি। ময়নাগুড়ি ব্লকের মল্লিকহাটের সখিন রায়ের কথা শুনেছিলাম এই মর্মে যে, তাঁর বাড়িতে একটা কমলা গাছে সিজনে প্রায় হাজারখানেক ফল ধরে। ডিসেম্বরের এক শীতল রবিবারে বন্ধু গোঁসাইয়ের সঙ্গে গাড়ি চেপে হাজির হলাম হসলু ডাঙায়। সেখানে সখিন রায়ের কথা বলতে একজন বলল, কাছেই! এক কিলোমিটার হবে। মাঝে জটিলেশ্বরের মন্দির। তারপরেই সখিন রায়ের সাকিন।

অবশ্য আমাদের এক কিলোমিটারের পথ পেরোতে তিন কিলোমিটার লাগল। জটিলেশ্বরের মন্দির থেকে সুপ্তিবাড়ির পথে আরও এক কিলোমিটার গিয়ে পেলাম সখিন রায়ের বাড়ি। রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে মাঠ পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে খোঁজ করতেই চোখে পড়ল অন্তত আড়াই-তিনশো কমলালেবুতে হলুদ হয়ে থাকা একটা গাছ। সখিন রায় গিয়েছিলেন গোরু আনতে দূরের মাঠে। তাঁর বাড়ির লোক পান আর গুয়া সুপুরি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। সখিন রায় ফিরতেই আমরা তাঁর কাছে সেই আশ্চর্য গাছের কাহিনি জানতে চাইলাম।

জানা গেল, কমলা বীজ থেকে চারা গজিয়েছিল। সে চারা তুলে এনে পুঁতেছিলেন উঠোনের ধারে। তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে ওটা কমলারই চারা। ফুট চারেক আকার হওয়ার পর নিশ্চিত হন। তখন গাছের চারপাশে ইটের গুঁড়ো আর গোবর সার দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছিলেন। বিশেষ আর কোনও যত্ন নেননি। এর পরেই হল অবাক কাণ্ড। গাছের বয়স পাঁচ হতেই ফল ধরা শুরু হল। অজস্র ফল। উজ্জ্বল রং। বড় আকার। মোটা খোসা। ছাড়ালে কোয়ার উপর থেকে সুন্দরভাবে উঠে আসে। স্বাদ আর গন্ধ চমৎকার। গত ভাদ্র মাসে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ফুল ঝরে যাওয়ায় এবার একটু কম ফলেছে (ভুটানেও ফলন একই কারণে কম এবার)। গত চার বছর ধরে প্রচুর কমলা ফলাচ্ছে এই গাছ। সখিন রায় অবশ্য বিক্রি করেন না। পরিবারের ছোটরাই রোজ দশ-বারোটা করে পেড়ে খায়। প্রতিবেশীদেরও দেওয়া হয়। আমাদেরও পেড়ে দেওয়া হল। চেখে দেখলাম, দিব্য! আহা! আমারও যদি এমন একটা কমলা বোঝাই গাছ থাকত।

সখিন রায় বললেন, এবার তিনি জমিতে কমলার চাষ করবেন বাণিজ্যিকভাবে। শুনে খুব আনন্দ হল। ডুয়ার্সে কমলালেবু চাষের সম্ভাবনা অসীম। আমার নিজের কিঞ্চিৎ চাষবাস সম্পর্কিত ধারণা আর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, বৈজ্ঞানিকভাবে চাষ হলে ভুটানের সেরা কমলার সঙ্গে পাল্লা দেবে ডুয়ার্সের কমলা। বিক্রির জন্য বাজারের কোনও অভাব নেই। সবুজ ডুয়ার্সের কমলা রংটা শুধু একবার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

নিঝুম ঠাকুর

নাগপুরে সম্ভব হলে ডুয়ার্সে কেন নয়?

ফলন ক্রমেই কমে আসছে দার্জিলিং-ভুটানের পাহাড়ে। বাজার দখল করছে নাগপুরের কমলা। এ সময় তাই প্রশ্ন উঠছে, ডুয়ার্সের মাটিতে বিকল্প চাষের অঙ্গ হিসেবে কমলালেবুর চাষকে জনপ্রিয় করা যায় না? ডুয়ার্সের মাটিতে ভাল জাতের কমলালেবুর ফলন কিন্তু নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন টোটোপাড়ায় একসময় জোরদার চাষ হত কমলার। কৃষিকর্মে অভ্যস্ত টোটোরা এখন হয়ত আর নতুন করে কমলা চাষ করে না। কিন্তু টুকি টোটো সেন্ডু টোটোর গোটা পঞ্চাশেক কমলালেবু গাছ এখনও টিকে রয়েছে সাক্ষী হিসেবে। মাদারিহাট ব্লকের উত্তরে ছেকামারি গ্রামে সতীশ নারজিনারি ফলের বাগানে এ সময় ঢুকলে কমলালেবুর সুগন্ধে মন ভরে যাবে। তেমনই বক্সা পাহাড়ে লেপচাখা-আদমার গ্রামে কিছু কমলালেবুর বাগান এখনও ফল দিচ্ছে। যেমন ছড়িয়ে রয়েছে সমতল ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে।

মরশুমি ফল হিসেবে কমলালেবুর খাদ্যগুণ নিঃসন্দেহে অপরিসীম। একাধারে ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট— প্রচুর ফাইবার থাকে বলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সাহায্য করে। পাহাড় ঘেরা ডুয়ার্সে শীতের প্রকোপ ঠেকাতে কিংবা অসুস্থ রোগীকে চাঙ্গা করে তুলতে অথবা স্কুল ফেরতা কচিকাঁচাদের টিফিন পিরিয়ডে সহজে পেট ভরাতে কমলালেবুর কোনও বিকল্প নেই। আজ যখন প্রথাগত চাষবাসের বেড়াজাল ভেঙে ডুয়ার্সের কৃষিজীবী মানুষ চাইছে দুটো পয়সা রোজগারের নিশ্চিন্ত পথ, তখন কমলালেবুর কথা ভাবা হচ্ছে কতটুকু?

জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগরে জেলা উদ্যান পালনের সরকারি দপ্তরে কমলালেবু চাষের এই দৈন্যদশার কথা জানতে গেলে আশার কথা শোনালেন আধিকারিক শুভাশিস গিরি। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কিছু নতুন কমলাবাগান তৈরির কাজ শুরু করেছেন তাঁরা। বক্সা এবং মেটেলিতে প্রায় ১১০ বিঘা জমিতে ৮০০০-এর বেশি কমলালেবুর চারা রোপণ করা হয়েছে, যেগুলি আনা হয়েছে কালিম্পঙের সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার থেকে। উদ্যান পালন বিভাগ ছাড়াও ডুয়ার্সের মাটিতে কমলালেবু চাষে উৎসাহ বাড়াতে সুলভে চারা বিলি করছেন সতীশ নারজিনারিও। তাঁর মত, 'ঢালু পাথুরে জমি, যেখানে জল দাঁড়ায় না, সেখানেই ভাল কমলালেবু চাষের ভাল ফল মিলতে পারে। ডুয়ার্সে বহু নদীর ধার বরাবর বা অন্যত্র এ ধরনের জমির তো কোনও অভাব নেই। অভাব কেবল রয়েছে উদ্যানের।'

যেমন উদ্যোগ প্রয়োজন যেসব লেবুর গাছের বয়স পনেরো-কুড়ি হয়ে গিয়েছে, সেগুলির বদলে নতুন উন্নতমানের চারা লাগিয়ে তার যত্ন নেওয়া। কারণ, পুরানো গাছে

লেবু উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পায়। কমলালেবুর ফলন কিন্তু শুরু হয়ে যায় গাছের বয়স চার পেরতেই। তবে পরিবেশ, জলবায়ু ঠিকঠাক থাকাটাও সুস্বাদু লেবু চাষের অন্যতম প্রধান শর্ত। কমলালেবুপ্রেমী মানুষের চাহিদা মেটাতে ডুয়ার্স জুড়ে আজ রাজ করছে পাঞ্জাব-নাগপুরের কমলা, যেগুলির ফলন হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা পরিবেশে। যার ফলে দরিদ্র মানুষের হাতে অতি সুলভে মরশুমি ফল তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ডুয়ার্সের হতভাগ্য কৃষিজীবীর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, 'এখানেও কি সেরকম কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে কমলালেবু ফলানো যায় না? হলে গুণমানে তা যে পাঞ্জাব বা নাগপুরের কমলার চাইতে কোনও অংশেই খারাপ হত না।' এ কথা নিশ্চিতভাবেই দাবি করে সেই চাষিই। কারণ সে এখনও সেই স্বপ্ন দেখে নিয়মিত।

ময়নাগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি ফরেস্ট পেরিয়ে চালসা। সেখান থেকে মালনদী পেরিয়ে ডান দিকের সরু রাস্তায় ঢুকতে হবে। সাবধান! দু'দিকে চা-বাগান, মাঝের রাস্তা পাকা, কিন্তু অনেক স্পিডব্রেকার। একদম গ্লেনগ্লাস চা ফ্যাক্টরির কাছে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। কিছুটা গেলেই গোরুবাথান বাজার। ডান হাতে পাকদণ্ডী খাড়া পাহাড় বেয়ে ৬ কিমি গেলেই স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে যাবেন। পাশাপাশি তিনটি পাহাড়ি গ্রাম। বিচগাঁও, রাইগাঁও ও গৈরিগাঁও। এখানে প্রায় সবার পদবি রাই। আর সকলেই নিরামিষভোজী কবীরপন্থী সন্ত। ৭২ বছরের যশবাহাদুর রাই তাঁর কমলালেবুর বাগান ঘুরিয়ে দেখালেন। কমলায় সবে পাক ধরেছে। গাছ থেকে ছিঁড়ে একটা খেতে দিলেন। খোসা ছাড়াতেই চারদিক সুগন্ধে ভরে গেল। খাসা মিষ্টি। সবার বাড়িতেই সুপারিবাগান আর তার মধ্যেই কমলালেবুর গাছ। পাতা-পচা জৈব সার আর গোবর দেন গাছের গোড়ায়। কোনওরকম কীটনাশক স্প্রে করেন না। বাইরের লোক আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এলেন ইন্দ্রমণি রাই, তিলক রাই, মহীন্দ্র রাই, গঙ্গা রাই, ইয়াওন কুমার আর বাহরমান সুব্বা। ইয়াওন কুমার বাংলা জানেন। এতক্ষণ আধা-নেপালি, আধা-হিন্দিতে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কুমার দাইজু জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাগানে। রাশি রাশি কমলা পেকে আছে। নিজেরাই গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যান মঙ্গলবাড়ি, ওদলাবাড়ি, সোমবাড়ি এবং মালবাজারে। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু সৎ মানুষগুলোর সাধের কমলালেবু বেশির ভাগ সময় সমতলের হিসেবি মানুষ কম দামে কিনে নেয়। তা কিনুক, কোনও লোভ বা ক্ষোভ নেই সহজ মানুষগুলোর। ডুয়ার্সের মাটিতে কমলালেবুর চাষ যে অসম্ভব নয়, সেই সুখবার্তাটি ডুয়ার্সের কোণে কোণে পৌঁছে দেবে এরাই।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

চা-বাগানের এই হাহাকারকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আত্মহত্যাকে আহ্বান

ডুয়ার্সের চা-শিল্পে উঠেছে হাহাকার। যে ডানকান ছিল চা-সাম্রাজ্যের সম্রাট, তাদের ১২টি চা-বাগিচাই তীব্র সংকটে। তার থেকেও বড় সংকট চা-শ্রমিকের জীবনে। বাগরাকোট, ধুমচিপাড়া, মুজনাই, রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগান থেকে প্রতিদিন ভেসে আসছে 'রামনাম সত্য হ্যায়' ধ্বনি। অনাহার-অপুষ্টিতে চা-বাগিচা শ্রমিকের মৃত্যু যে কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষের মৃত্যু নয়, মৃত্যুঘণ্টার ধ্বনি বেজে উঠছে ডুয়ার্সের কোনায় কোনায়! কারণ, চা-বাগিচার সঙ্গে শুধু চা-শ্রমিকেরই সম্পর্ক নয়, জড়িয়ে আছে সমগ্র ডুয়ার্সের আর্থ-সমাজ, এমনকি রাজনৈতিক অবস্থানও। চা-বাগিচার শ্রমিক বস্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এখানকার ছোট-বড় শহর। গড়ে উঠেছে দোকান ও বাজার। স্থাপিত হয়েছে সিনেমা হল। আছে লেদ মেশিন ও কর্মরত শ্রমিক। চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য হয় মেলা। শহর থেকে আসে নানা ধরনের বিক্রেতা। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও ওষুধ না থাকলেও বাগানের শ্রমিকদের কেন্দ্র করে আছে ডাক্তারের চেম্বার ওষুধের দোকান। চা-বাগিচা বন্ধ থাকলে শ্রমিকের রোজগার নেই। দোকান আছে, খরিদ্দার নেই। জিনিসের চাহিদা আছে, কেনার ক্ষমতা নেই। রোগ আছে, রোগীও আছে। প্রাইভেট চেম্বারে কোনও ভিড় নেই। লেদ মেশিন অলস হয়ে পড়ে আছে। বন্ধ চা-বাগান থেকে যন্ত্র আনার দরকার নেই। মেরামতের কাজ হবে কী করে, বাগানটাই যে বন্ধ। ব্যাঙ্কের সুদ গুনে যে বেকার যুবকটি লেদ মেশিন বসিয়েছিল, সে শূন্যদৃষ্টি নিয়ে বন্ধ চা-বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে ব্যাঙ্কের সুদ। বাড়তে থাকে এনপিএ। সিনেমা হলে দর্শক নেই। টিকিট কেনার পয়সা নেই। পয়সার জন্য রোজগারের দরকার। হলের সামনে যে চিনাবাদাম বিক্রেতা, তার ডালা শূন্য। বাদাম কিনতেও পয়সা লাগে। লোকাল বাসে নেই যাত্রীর ভিড়। বাসের অধিকাংশই তো চা-বাগানের শ্রমিক। গত পুজোর বাজার নিয়েও শহরের বড় দোকান থেকে ফুটপাতের দোকানদার— সবারই একই আক্ষেপ, খরিদ্দার নেই। বাগান থেকে শ্রমিকরা আসছেন না। চা-বাগান বন্ধ হলে শুধু চা-বাগান শ্রমিকের জীবনেই অনাহারের নিষ্ঠুর ভ্রুকুটি নেমে আসে না, অন্ধকার নেমে আসে গোটা উত্তরবাংলার জনজীবনে।

ডুয়ার্সের চা-বাগান ছবি— এখন

মেটেলির নাগেশ্বরী, মালের বাগরাকোটের মৃত্যুমিছিল এগিয়ে চলেছে মাদারিহাটের ধুমচিপাড়া, ঢেকলাপাড়া, মুজনাই, রাইমাটাং, রামঝোরা, কাঁঠালগুড়ি চা-বাগানের মৃত্যুমিছিলকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গের অন্য চা-বাগানগুলির দিকে। অনাহারে মৃত্যুর এই হুংকার কেবল তৃণমূলের রাজত্বকালে নয়, সূচনা বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকাল থেকেই, দক্ষিণের আমলাশোল থেকে শুরু হয়ে উত্তরের চা-বাগান। তখনও বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল, এটি বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রমাণ করতে দক্ষিণপন্থীদের প্রচার। আজ তৃণমূলের রাজত্বেও একই যুক্তি, এটি তৃণমূল সরকারকে হেয় করতে বাম তথা তৃণমূল বিরোধীদের কথা। সে দিন বন্ধ চা-বাগান

শ্রমিকের মৃত্যুমিছিলের তথ্য বামফ্রন্ট সরকার অস্বীকার করলেও চা-বাগানগুলির মুমূর্ষু চেহারাকে অস্বীকার করাতে পারেনি। তৃণমূল সরকারও একই কায়দায় অনাহারে মৃত্যু স্বীকার করতে না চাইলেও চা-বাগানে মৃত্যুমিছিলের ভয়াবহতাকে অস্বীকার করতে পারছে না। দফায় দফায় শুধু যে নেতাদের সেখানে পাঠাতে হচ্ছে তা তো নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত ঘোষণা করতে হয়েছে, চা-বাগানের মালিকরা যদি বাগান বন্ধ করে রাখে, তবে সেই বাগান সরকার অধিগ্রহণ করে নেবে। অথচ উত্তরবঙ্গের যে পাঁচটি চা-বাগান বাম সরকার অধিগ্রহণ করেছিল, তৃণমূল সরকার পরিচালনায় চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়ে সেগুলি গত বছরই ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দিয়েছে। ফের তারাই আজ মালিকের ব্যর্থতার জন্য চা-বাগান অধিগ্রহণের বাণী শোনাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে এসব বিশ্বাস করতে হবে! অন্য দিকে অধিগ্রহণের প্রশ্নে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে যেভাবে দায়িত্ব নেবার কথা বলছে, তাতে তাদের সদিচ্ছা নিয়েও তো প্রশ্ন উঠছে। চা-বাগানের জমির মালিক তো আসলে রাজ্য সরকার। সরকারি নিয়মকানুন মেনেই চা-বাগিচা মালিক উৎপাদন পরিচালনা করবে— এই শর্তেই তারা জমিগুলি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়ে যায়। বাগান চালু রাখা এবং শ্রমিকদের প্রতিটি পাওনা মেটানো শর্তগুলির অন্যতম। এর যে কোনও একটি শর্ত ভঙ্গ হলেই মালিক অভিযুক্ত হবে এবং রাজ্য সরকার সেই লিজ বাতিল করে দেবে। পরিতাপের বিষয়, এক বিরাট সংখ্যক চা-বাগিচা মালিক তাদের লিজ নবীকরণের ন্যূনতম দায়িত্বও পালন করেনি। অন্য দিকে রাজ্য সরকারও সেই লিজ বাতিল তো অনেক দূরের প্রশ্ন, কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি।

ডুয়ার্সের চা-বাগান ছবি— তখন

২০০৩ সালের ৭ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির জেলাশাসক জানালেন, ওই জেলায় ২২টি চা-বাগান বন্ধ বা পরিত্যক্ত হয়ে আছে। বাগানগুলির এই হাল হওয়ার কারণে ৯৪,৩৪৭ জন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ, যারা এই বাগানগুলিতে বিজা অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে কাজ পেত। তারাও কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এমনকি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ স্বয়ং জানিয়েছিলেন, গত এক বছরের মধ্যে সেখানে অনাহারে যতজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা ৩২০। সেই সময় প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস, তারা বিধানসভায় জানিয়েছিল, উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা-বাগানগুলিতে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে ৪৯৬ জনের। মজাটা এখানেই। ক্ষমতায় থাকলে কর্মহীন শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটলে তা অনাহারে মৃত্যু হয় না। সেটা ঘটে অপুষ্টি বা ওই জাতীয় কোনও রোগে। আর বিরোধী দলে থাকলে সেই মৃত্যু হবে অনাহারে। আজ সিপিএম তথা বাম দলগুলি বিরোধী আসনে। তারা এখন বলছে, এটি অনাহারে মৃত্যু। রাজনৈতিক চাকা ঘুরে গিয়ে এখন তৃণমূল ক্ষমতায়, তাই এই মৃত্যু অনাহার বা অপুষ্টির পরিবর্তে অন্য কোনও রোগে মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বন্ধ চা-বাগানের উপর সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিশনার দু'টি তুলনামূলক তথ্য পেশ করেছিলেন। একটি রামঝোরা চা-বাগান, যখন সেটি চালু ছিল। অপরটি এই বাগান বন্ধ হবার পরে ৬টি শ্রমিক পরিবারের উপর নমুনা বা স্যাম্পল সার্ভে। বন্ধ থাকা বাগানটির উপর ওই সমীক্ষার রিপোর্ট ৩০/১২/২০০৩-র সকাল থেকে ৩১/১২/২০০৩ সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রমিকদের খাদ্যতালিকা। সে দিনের সেই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য আজকের জন্যও প্রযোজ্য।

অমর্ত্য সেন তাঁর 'পভারটি অ্যান্ড ফেমিন'

বাগান বন্ধ হবার পূর্বে খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ

পরিবারের কর্তা	মুক্তা মুন্ডা ৩ জন পূর্ণবয়স্ক	লক্ষ্মণ লোহার ২ জন প্রাপ্তবয়স্ক	পাসোনা মুন্ডা ৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক	রূপেন ওরাওঁ —	জৈন সোসাইন ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক	পঞ্চ সিং ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক
পরিবারের আয়তন (প্রাপ্তবয়স্ক + অপ্রাপ্তবয়স্ক)	৩ জন অপ্রাপ্ত	৩ জন অপ্রাপ্ত	২ জন অপ্রাপ্ত	—	৪ জন অপ্রাপ্ত	৩ জন অপ্রাপ্ত
খাদ্যশস্য	প্রতিদিন ১ কেজি চাল ১ কেজি আটা	প্রতি ১৫ দিনের ৬ কেজি চাল ৪ কেজি আটা	প্রতি সপ্তাহে ১০ কেজি চাল ৫ কেজি আটা	প্রতি সপ্তাহে ৪ কেজি চাল ৯ কেজি আটা	১৫ দিনে ১৬ কেজি চাল ১০ কেজি আটা	১৫ দিনে ২০ কেজি চাল ৭.৫ কেজি আটা
ডাল (মুগ + মসুর)	প্রতি সপ্তাহে ০.৫-১ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম	প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম	প্রতি সপ্তাহে ২০০ গ্রাম	প্রতি সপ্তাহে ২০০ গ্রাম	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম
আলু	প্রতি সপ্তাহে ৫ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ০.৫-১ কেজি	—	প্রতি সপ্তাহে ১ কেজি	—	প্রতি সপ্তাহে ৫ কেজি
অন্যান্য সবজি	প্রতি সপ্তাহে ৩ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ০.৫-১ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ২ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ৫ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ৬ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ৩ কেজি
মাছ ও মাংস	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম	১৫ দিনে ২৫০ গ্রাম	প্রতি সপ্তাহে ১ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ১ কেজি	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম মাছ ও ৫০০ গ্রাম মাংস	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম মাছ ও ২৫০ গ্রাম মাংস
ডিম	প্রতি সপ্তাহে ৬টি	১৫ দিনে ৬টি	প্রতি সপ্তাহে ৬টি	—	প্রতি সপ্তাহে ৬টি	প্রতি সপ্তাহে ৬টি
রান্নার তেল	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	১৫ দিনে ১০০-২৫০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রা. তেল ২৫ গ্রা. ঘি	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.

দুধ	প্রতিদিন ২৫০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	প্রতিদিন ২৫০ গ্রা.	প্রতিদিন ২৫০ গ্রা.	প্রতিদিন ২৫০ গ্রা.	—
ফল	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	১৫ দিনে ১০০-১৫০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ২৫০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	প্রতি সপ্তাহে ৭৫০ গ্রা.
শখের ফল	প্রতি সপ্তাহে ৫০০ গ্রা.	শূন্য	মাঝেমধ্যে	মাঝেমধ্যে	মাঝেমধ্যে	শূন্য
স্ন্যাক্স	১টা (শিঙাড়া, মিষ্টি, জিলিপি, বিস্কুট, চানাচুর) প্রতিদিন চায়ের সঙ্গে	২ টুকরো পাউরুটি	কিছু বলা হয়নি	সন্ধেবেলায় মুড়ি	কিছু বলা হয়নি	কিছু বলা হয়নি
ক্যালোরি প্রতিদিন মাথাপিছু	১৮০০	১১৪৭	২৮১৭	২৪৮৪	১৯৭৯	২৭৬৩

উপরের এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বাগান বন্ধ হওয়ার আগে যখন শ্রমিকরা কাজ পেত, তখন ওইসব শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন মাথাপিছু ১২০০ থেকে ২৮০০ ক্যালোরি খাদ্য পেত। ওই সমীক্ষকরা বাগান বন্ধ হওয়ার পর একই পরিবারের সদস্যদের উপর নমুনা সমীক্ষার যে ফল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে পেশ করেছিলেন, সে তথ্য শুধু ভয়াবহই নয়, তাকে অনাহার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ওই সমীক্ষায় ৩০/১২/২০০৩ সকাল থেকে ৩১/১২/২০০৩ সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মহীন শ্রমিকদের খাদ্যগ্রহণের তথ্য

নাম	মুক্তা মুন্ডা	লক্ষ্মণ লোহার	পাসোনা মুন্ডা	রূপেন ওরাওঁ	জৈন সোসাইন	পঞ্চ সিং
পরিবারের সদস্যসংখ্যা	পূর্ণবয়স্ক- ৩ অপ্রাপ্ত- ২	পূর্ণবয়স্ক- ২ অপ্রাপ্ত- ১	পূর্ণবয়স্ক- ১ অপ্রাপ্ত- ২	পূর্ণবয়স্ক- ৩ —	পূর্ণবয়স্ক- ২ অপ্রাপ্ত- ৪	পূর্ণবয়স্ক- ৪ অপ্রাপ্ত- ৩
পরিবারের মৃত্যু	রজনী মুন্ডা বয়স ১১ মৃ. ৬/১০/০৩	মুকেশ লোহার বয়স বলা হয়নি মৃ. ৩ সেপ্টেম্বর	মিতা মুন্ডা বয়স ২০ বছর মৃ. ২৯/১০/০৩	—	জৈনু সোসাইন বয়স ৩০ মৃ. ৩৬/১০/০৩	—
৩০ ডিসেম্বর রাত্রি	৫০০ গ্রা. চাল	৫০০ গ্রা. চাল	২০০ গ্রা. চাল	শূন্য	শূন্য	১০০ গ্রাম
৩১ ডিসেম্বর বিকেল	শূন্য	শূন্য	২০০ গ্রাম চাল, মাঠ থেকে সংগ্রহ করে আনা ঢেঁকি শাক	২০০ গ্রাম চাল, জঙ্গল থেকে আনা ২০০ গ্রাম বন্য পাতা এবং ১০০ গ্রাম আলু	শূন্য	২০০ গ্রা. চাল, ১৫০ গ্রা চা পাতা ও কিছু সবজি
৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
৩১ ডিসেম্বর রাত্রি	পিতা কাঠ বিক্রি করতে গিয়েছে, তার অপেক্ষায়	কোনও কিছুই নেই	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক কিছু খাদ্যদান	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক কিছু খাদ্যদান	কোনও কিছু নেই	কোনও কিছু নেই
খাদ্যে ক্যালোরির মাত্রা	৮৭৬	৬৯৬	৭৩২	২৮৬	২৭৯	২০৩

এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বাগান বন্ধ হওয়ার পর ওই পরিবারের খাদ্যের পরিমাণ নেমে এসেছিল ২০০ ক্যালোরির নিচে। অথচ একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ২১০০ ক্যালোরির প্রয়োজন।

গ্রন্থে বলেছেন, খাদ্য হচ্ছে বিনিময়মূল্যে অধিকৃত সম্পদ। এই সম্পদের মালিকানা অর্জনে ৫টি জিনিসের প্রয়োজন— ১) সেই ব্যক্তির হাতে কাজের সুযোগ আছে কি না, থাকলে তারা কতদিন সেই কাজের সুযোগ পায়; ২) সে যদি কায়িক শ্রম ছাড়া অন্য সম্পদ বিক্রি করতে পারে, তবে সে কত রোজগার করে, যা দিয়ে সে যদি কিছু কিনতে চায় (এ ক্ষেত্রে খাদ্য), তবে তা কিনতে পারে; ৩) ক্রয়ের জন্য সম্পদের মূল্য কত এবং সে যে পরিমাণ উৎপাদিত শ্রম বিক্রি করতে পারে, তার বিক্রয়মূল্য কত; ৪) সে তার শ্রমসম্পদের বিনিময়ে কী উৎপন্ন করতে পারে এবং কী সম্পদ ক্রয় করতে পারে; ৫) সে সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সুযোগ ভোগ করতে পারে কি না এবং তার রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না।

অধ্যাপক সেনের মতে, অনাহার থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে খাদ্যের উপর তার মালিকানা স্থাপনের উপর। তাই মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি বা পরিবারের এমন একটা আয় থাকতে হবে, যা দিয়ে সেই ব্যক্তি খাদ্যসহ তার বাঁচার বুনিয়াদি রসদগুলি ক্রয় করার ক্ষমতা রাখে। তাই এটা স্পষ্ট, কর্মহীন বা রোজগারের সুযোগ না থাকলে মানুষের খাদ্যের মালিকানারও সুযোগ নেই। মালিকানা না থাকলে যেমন কোনও ছাদের তলায় আশ্রয়গ্রহণের অধিকার থাকে না, তেমনই খাদ্যের উপর মালিকানা স্থাপনের বিনিয়োগযোগ্য কোনও সম্পদের সংস্থান না থাকলে তার খাদ্যও জোটে না। রোজগারহীন মানুষের তাই খাদ্য জোগাড়ের কোনও উপায় থাকে না।

তাহলে চা-বাগিচা শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ কী

এই মুহূর্তে চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর যে সমীক্ষা চলছে তা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবে ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিশনার যে তথ্য আদালতে পেশ করেছিল, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। মানুষের বাঁচার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেটা যেমন সৃষ্টির শুরুতেও ছিল, এখনও তা-ই আছে। ২০০৩ সালে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা খাদ্য না পেয়ে যেমন মৃত্যুর কোলে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, আজও তা-ই হচ্ছে। সে দিনও সমাজের প্রভুরা বলতেন, অনাহারে নয়, অপুষ্টিতে মারা গিয়েছে। আজও একই কথা বলে চলেছেন প্রভুরা।

সে দিনের ওই সমীক্ষায় জানানো হয়েছিল, সমগ্র এলাকা জুড়ে চা-গাছের ফুল, বন্য পাতা, বন্য গাছের মূল, বাঁশের কচি ডাল, যা কিছুদিন আগেও মানুষের খাদ্য বলে কেউ ভাবত না, সেগুলিই এখানে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা নিজেরাই জানিয়েছে, বাগান ও তার আশপাশের এলাকা জুড়ে সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙের খোঁজ পাওয়া যাবে না। কোনও খাবার না পেয়ে সেগুলিকেই তারা খাদ্য হিসেবে মেরে, বলতে গেলে নির্মূল করে দিয়েছে। সরকারি তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেল্‌থ (ACMOH) ডাঃ মণীশ সোমের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দপ্তর রাইমাটাং চা-বাগানে ৩৩৬ জন চা-শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর যে তথ্য পেশ করেছিল, তাতে দেখা গিয়েছে, ওই শ্রমিকরা সবাই অপুষ্টিতে ভুগে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সমীক্ষক দল জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল থেকে কাঁঠালগুড়ি চা-বাগানের শ্রমিক বিপতা লোহারের (৪০ বছর) ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে দেখেছিলেন, ওই সার্টিফিকেটে লোহারের মৃত্যুর কারণ দেখানো হয়েছে—

'Cardio respiratory failure in a case of severe anæmia with malnutration.'

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, ক্যালোরি মানুষের জৈবিক শক্তির প্রয়োজনীয় মাত্রা বোঝালেও একে কিন্তু পুষ্টিনির্ধারক বলা যাবে না। কারণ, যে কোনও জ্বালানিতে অগ্নিসংযোগ করে তাপ উৎপাদন করলেই যেমন গাড়ির ইঞ্জিনের চালিকাশক্তি হয় না, তেমনি যে কোনও খাদ্য পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে ক্যালোরি উৎপাদন করলেই পুষ্টি হয় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অপুষ্টির সংজ্ঞায় জানিয়েছে— 'The cellular imbalance between supply of nutrients and energy and the body demand for them to ensure growth, maintenance and specie function.'

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অপুষ্টি আজ অসুস্থতা ও মৃত্যুর প্রধান কারণে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন প্রোটিন অভাবে অপুষ্টি, যাকে বলা হয় Protein Energy Malnutrition (PEM)। এই প্রোটিনের যে রোগগুলি মানুষের জীবনীশক্তিকে হরণ করে চলেছে, তাদের মধ্যে দু'টি হল হাওয়া শিরকর ও ম্যারাজোমাস। এই রোগে মৃত্যু হলে ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হবে, এই রোগে মানুষটির মৃত্যু হয়েছে। এই রোগটি কেন হল তা কিন্তু জানানো হবে না। বেঁচে থাকার জন্য তাই প্রয়োজন হয় একটা ন্যূনতম আয়, যা দিয়ে মানুষ তার খাদ্য ক্রয় করতে পারে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) এবং প্ল্যানিং কমিশন ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজারদর ধরে সুষম খাদ্যের খরচ মাসিক (৩০ দিন) ধরে মাথাপিছু যে দাম নির্ধারণ করেছিল, তাতে আইসিএমআর-এর হিসেবে গ্রামাঞ্চলের জন্য খাদ্যের মাথাপিছু খরচ ৪৯০.০৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলের জন্য ৬৪৭.৪৭ টাকা প্রয়োজন। প্ল্যানিং কমিশনের হিসেবে এই অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫১২.১৮ টাকা ও ৬৪৭.৪৭ টাকা। আশ্চর্যের কথা, এই প্ল্যানিং কমিশনই কিন্তু সে দিন গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণের জন্য আয়ের মাত্রা ৩৫০.১৭ টাকা বলে নির্দিষ্ট করেছিল।

অনাহার, ক্ষুধা, অপুষ্টি ও মৃত্যুর কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। আমলাশোলের লুনা শবর আর উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার মুকেশ লোহারের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার। এদের মৃত্যুর মধ্যে কিন্তু কোনও ব্যবধান নেই।

আমলাশোলের লুনা শবর তার অভুক্ত অশক্ত দেহ নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ভাঙা মাটির দাওয়ায় এক দানা ভাতের জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিল। কে দেবে তাকে ভাত? যাদের কানে সেই কাতর প্রার্থনা পৌঁছাচ্ছিল, তাদেরও দৃষ্টিশূন্য। ঘরে চালের হাঁড়ি শূন্য। লুনা শবর অনাহারে অপুষ্ট জর্জরিত দেহে হাঁটা তো দূরের কথা, বসার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। ক্ষমতা বলতে ক্ষীণ কণ্ঠে করুণ আকুতি। সেটাও তার শূন্য পাকস্থলী একদিন শুষে নিল। অস্থিচর্মসার দেহে কোটরে ঢুকে যাওয়া ধূসর চোখের মণির মধ্যে কিন্তু জেগে ছিল এই সমাজপিতাদের প্রতি ধিক্কার।

উত্তরবঙ্গের রামঝোরা চা-বাগানের মুকেশ লোহারও তো তার পেশিবহুল হাতে বাগানের জিয়নকাঠি ধরে রাখতে প্রতিদিন কাজে যেত। একদিন বন্ধ হয়ে গেল বাগানটা আচমকাই। লক-আউটের আইনি ব্যাখ্যা তারা জানে না। বুঝতে পারে বাগান বন্ধ, কাজ নেই, রোজগার

যা কিছুদিন আগেও মানুষের খাদ্য বলে কেউ ভাবত না, সেগুলিই এখানে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা নিজেরাই জানিয়েছে, বাগান ও তার আশপাশের এলাকা জুড়ে সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙের খোঁজ পাওয়া যাবে না।

নেই। তারপর তো সেই একই ইতিহাস। দক্ষিণের আমলাশোল আর উত্তরের রামঝোরা চা-বাগান যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান ঘুচিয়ে এক বিন্দুতে মিশে যায়।

মৃত ব্যক্তি নাকি অনেক সময় জীবিত অবস্থা থেকে বেশি শক্তিশালী হয়। কে জানত আমলাশোলের লুনা শবরকে? কে চিনত রামঝোরা চা-বাগানের মুকেশ লোহারকে? এরা কেউ জানত না একে অপরকে। ক্ষুধা এদের না দেখিয়েও চিনিয়ে দিল একে অপরকে। আমলাশোলের লুনা শবরের দু'মুঠো ভাতের আকুতি যতই ক্ষীণ হোক, হাজার কিলোমিটার ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল রামঝোরা চা-বাগানের মুকেশ লোহারের খাদ্য অন্বেষণের সঙ্গে। ওদের হৃৎস্পন্দন থেমে গেলেও ধিক্কারের সুর উঠেছিল এই রাজ্যে। অনাহার অস্বীকার করার দায়ও উঠে এল দক্ষিণ ও উত্তরের সমাজপিতাদের কণ্ঠে। ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক রাজ্য সরকারের মুখের চুনকালি মুছতে বেয়াড়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, লুনা শবরের মৃত্যু হয়নি অনাহারে। তার মৃত্যু হয়েছে যক্ষ্মায়। মুকেশ লোহারের মৃত্যুর কারণ জলপাইগুড়ি প্রশাসন জানাল, অনাহার। এর কারণ 'severe anæmia with malnutrition'।

দেশ এগিয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সাজছে নানা আঙ্গিকে। নিত্যনতুন কর্পোরেট সেক্টরের চোখ ধাঁধানো অত্যাধুনিক নার্সিং হোম দেশ ও রাজ্যের গৌরবের বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। একই সঙ্গে কী সৌভাগ্য যক্ষ্মা রোগের! আগেও একে বলা হত 'রাজরোগ'। এখনও তার গৌরবের মুকুটে একই পালক।

চিকিৎসাশাস্ত্র কিন্তু অন্য কথা বলে। তারা জানিয়েছে, যক্ষ্মার উৎসভূমি অনাহার ও অপুষ্টি। আর যক্ষ্মা যদি হয়েই থাকে, তবে গণপ্রজাতান্ত্রিক ভারত তথা প্রগতির রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগের চিকিৎসা কি শুধু বসু, ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব এবং তাদের রাজপুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত? এ দেশের সবচেয়ে দামি সরকারি হাসপাতালে কুকুরের ডায়ালিসিসের জন্য দামি ডাক্তাররা ছোটাছুটি করেন। আর লোহার বা শবরদের যক্ষ্মা হলে তাদের পরিণতি মৃত্যু। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তো বলা হয়েছে, যক্ষ্মাতে এখন মৃত্যুর ঘটনার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও বলা হয়, যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগীদের আগের মতো পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক করে কোনও স্যানেটোরিয়ামে রেখে চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই কার্শিয়াঙের সেই একদা বিখ্যাত টিবি স্যানেটোরিয়ামকে আক্ষরিক অর্থেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সেখানে অন্য কিছু করার কথা ভাবা হচ্ছে। তাই লুনা শবরের মৃত্যু যদি অনাহারে না হয়ে যক্ষ্মাতেই ঘটে থাকে, তবে তার দায় তো সরকার তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের। একই কথা প্রযোজ্য রামঝোরা চা-বাগানের মুকেশ লোহারের ক্ষেত্রেও। খিদে পেলে যদি খাদ্য না পায়, রোগ হলে যদি চিকিৎসা না হয়, তবে সরকারি কেতাবি ভাষায় যা-ই বলা হোক না কেন, তাকে তো অনাহারে মৃত্যুই বলতে হবে।

চা-বাগিচার অসুখ শ্রমিকের অসুখ

রোগীর চিকিৎসার জন্য শুধু ওষুধের কথা বললেই চলে না। রোগীর যন্ত্রণাকে দেখতে হয়, বুঝতে হয়, তারপর চিকিৎসার জন্য ওষুধ নির্বাচন করতে হয়। তেমনি শ্রমিকের অসুখের খবর না জানলে চা-বাগিচার অসুখের খবর যেমন জানা সম্ভব নয়, তেমনি তার নিরাময়ের উপায়গুলিকেও খোঁজা সম্ভব হবে না।

এই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার ঢোকলা পানা চা-বাগানের চা-শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনার উপর তাঁদের সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই রিপোর্টের মধ্যেই ধরা পড়ে যায় চা-বাগিচার অসুখের চেহারা ও তার কারণ।

১৯১১ সালে ৫০০ একর আয়তনের এই চা-বাগানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাগানটির স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৬০২ জন। ২০০০ সালে সুব্রত ঘোষ নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী এই চা-বাগানটি ক্রয় করেন। চা-বাগিচা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই প্রয়োজন ছিল কোনও এক অভিজ্ঞ ম্যানেজার নিযুক্ত করা। তিনি তা না করে তাঁর হোটেলের এক প্রাক্তন ম্যানেজারকে এই হোটেলের ম্যানেজারের পদে বসিয়ে দেন। এই বাগানে এর আগে কোনও শ্রমিক অশান্তি বা ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেনি। এই বাগানের ব্যালেন্স শিটে কোনও ক্ষতির কথাও নেই।

শ্রমিকরা জানিয়েছে, বাগানটি বন্ধ করার আগে মালিক এই বাগানের বহু সম্পদ সরাতে শুরু করেছিলেন। বাগানের ট্রাক্টর, ইঞ্জিন, কির্লোস্কর, জেনারেটর জিপ, ১০ টন লোহা অন্য কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের সামনেই মালিকরা এগুলিকে সরিয়ে নিয়েছিল। সরল শ্রমিকরা এগুলো নিয়ে ভাবেনি, তবে 'বাবু' কর্মচারীরা মালিকের প্রতি আনুগত্য দেখাতে কোনও প্রতিবাদ করেনি। ভাবটা যেন এমন, চা-বাগান যাবে কোথায়? বাবুদের তো কেউ সরাবে না।

বাগানটি বন্ধ করে দেবার তিন মাস আগে থেকেই বাগানের শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া বন্ধ হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে রেশন দেওয়া তারও আগে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল, শ্রমিকদের মজুরি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে টাকা নিলেও তা প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। এটি ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৯৭৭ সাল থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওই টাকা জমা না দিয়ে মালিক আত্মসাৎ করে। শ্রমিকদের জোরালো দাবিতে শেষ পর্যন্ত মালিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু কোটি টাকার বকেয়া ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড় পেয়ে যায় মালিক।

একই ইতিহাস ৬০৪.৩২ একর আয়তনের রামঝোরা চা-বাগানের। এই বাগানের স্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১১০৩ জন। ১৯৯১-৯২-এ এখানে উৎপাদিত হয়েছিল ৯ লক্ষ কেজি চা। ১৯৯৩-৯৪-এ বাগানটির মালিকানা আসে হনুমান টি কোম্পানির হাতে। তার পর থেকেই সেই একই রকম বাগান লুটের ইতিহাস। মালিক যখন শ্রমিকদের অন্ধকারে রেখে বাগান ছেড়ে চলে যায়, তখন শ্রমিকদের মজুরি বাবদ পাওনা ছিল ২০.৪৮ লক্ষ টাকা, রেশনের জন্য পাওনা ছিল ৬.৮৭ লক্ষ টাকা আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য পাওনা ছিল ৬৮.৩০ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞ শাসক ও তাঁর অনুগতদের কাছে তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, শ্রমিকদের কাছে তাহলে অনাহার ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা থাকে?

আজকে ডানকান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মতো বৃহৎ কোম্পানির মালিকানাধীন ১২টি চা-বাগানের শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। সেই বাগানগুলিতে চলছে অঘোষিত বন্ধ। এখানেও শ্রমিকদের মজুরি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ টাকা কাটা হলেও সেই টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়েনি। এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোনও শাস্তি তাদের পেতে হয়নি। লিজকৃত জমি নবীকরণ বাধ্যতামূলক। তা না হলে সেই লিজ বাতিল করে জমি অধিগ্রহণের অধিকারী রাজ্য সরকার। একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই ৬০টি চা-বাগানের মালিক এই নবীকরণ না করে দিব্যি বছরের পর বছর চা-বাগান চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কাছ থেকে সরকারের পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল তখন ৬১.৭৬ লক্ষ টাকা, টি বোর্ড তাদের অনুদান দেওয়ার সময় এই জমি নবীকরণ করা হয়েছে কি না তা দেখা বাধ্যতামূলক হলেও কোনও অদৃশ্য সুতোর টানে তা না মেনে ঢালাও অনুদান দিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষেত্রেও আছে অনুরূপ শর্ত। তবু তারাও দিয়ে চলেছে ঋণ। বাড়ছে ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ বা NPA।

সবাই মালিকের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের লুটে সহায়তা করে চলেছে। অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের কথা ভাবার সময় তাদের নেই।

সৌমেন নাগ

শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল কি সবটাই ভগবানের হাতে?

মন্ত্রীমশাইয়ের অকাট্য যুক্তি

ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানে শ্রমিক মৃত্যুর ক্রমাগত খবরে বিচলিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তর্কবিতর্ক, ধর্মঘট, রিলে অনশন— এসব তো চলছেই। কিন্তু অনাহার, চিকিৎসার অভাবে একের পর এক মৃত্যু ঘটছে তা মানতে নারাজ মন্ত্রীমশাই। তাঁর যুক্তিগুলি অতি স্পষ্ট— এক, কোনও চা-বাগান বন্ধ হলেই রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিকদের দু'টাকা কেজি দরে চাল এবং তিন টাকা কেজি দরে গম দেওয়া হচ্ছে। দুই, এর আগে বাগান বন্ধ হওয়ার এক বছর পরে ফাউলি (FAWLOI)-র টাকা দেওয়া হত আর তাতেও হত অনিয়ম। কিন্তু বর্তমান সরকার তিন মাসের মধ্যেই সেই টাকা দিচ্ছে। তিন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস ফান্ডে ১০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। চার, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। ফলে অনাহার বা বিনা চিকিৎসায় কোনও চা-শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে তা মেনে নেওয়া যায় না। জন্মমৃত্যু আসলে ভগবানের হাতে। আর বন্ধ চা-বাগান খোলা বা সরকারের অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, পাট ও চা-বাগানের আইন কেন্দ্রের হাতে। তাই রাজ্য সরকারের তরফে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার অনেক অসুবিধা রয়েছে। তবুও চেষ্টা চলছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ?

এ দেশের সর্বোচ্চ আদালত একটি রিট পিটিশন (নং ৩৫৬/২০০৬) মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ অগাস্ট ২০১০-এ একটি রায় দিয়েছিল। ওই রায়ে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা আছে— কোনও চা-বাগানের মালিক যদি ছ'মাসের বেশি সময় ধরে বাগান ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে ১৯৫৩ সালের কেন্দ্রীয় চা-আইনের ধারা অনুযায়ী, বিশেষ করে ১৬খ, ১৬গ, ১৬ঘ ও ১৬ঙ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার সেই চা-বাগানটি সরাসরি অধিগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে কেন্দ্রীয় সরকার ওই চা-বাগানের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে।

উল্লিখিত রায় মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের হাতেও রয়েছে অনেকটা ক্ষমতা। কোনও চা-বাগানের মালিক শ্রমিক-কর্মচারীদের নিজস্ব প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দিয়ে যদি আত্মসাৎ করে তাহলে রাজ্য সরকার ফৌজদারি আইন মোতাবেক তার বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে জেলে পুরতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ওই কোম্পানির লিজ বাতিল করে সুনির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী অন্য কোনও কোম্পানিকেও বাগানটি দিতে পারে।

কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, টি-বোর্ড, ডিবিআইটি আজ পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা-বোনাস-পিএফ-গ্র্যাচুইটি আত্মসাৎকারী কোনও চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে এমন খবর নেই। যেসব চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও লক-আউট বা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ছাড়াই ফ্যাক্টরি বন্ধ রেখেছে, উৎপাদন থামিয়ে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে নেই, সেই খবরও। বাম আমলেও মালিকরা যেমন নিশ্চিন্তে ছিল, অ-বাম আমলেও তারা নিশ্চিন্তেই আছে। শুধু তাদের নিশ্চিন্তে থাকার কথাই বা বলি কীভাবে? বছরের পর বছর চা-বাগান রিপ্ল্যান্টেশন বন্ধ রেখে বাগানটিকে যথাসম্ভব রুগ্ণ করে বহু চা-বাগান মালিক বিআইএফআর-এর দ্বারস্থ হয় যথাসম্ভব টাকা আদায়ের জন্য। আর তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয় বারবার।

মানুষের কিছু প্রশ্ন ছিল

চা-বাগানের মালিক বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনার কোটি কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ উৎপাদন বন্ধ করছেন। ব্যাঙ্ক-সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করছেন না। লিজ জমির খাজনা, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, নানা ধরনের কর বাবদ বিপুল টাকা বাকি ফেলে রেখেছে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ দু'-চার মাস নয়, বছরের পর বছর।

(ক) আজ পর্যন্ত মোট কত পরিমাণ অর্থ বকেয়া দায় হিসেবে রয়েছে, তার সবিস্তারিত তথ্যটি কি কারও কাছে আছে?

(খ) 'টি-বোর্ড' নামক স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রতিষ্ঠান, তারাই বা কী ভূমিকা পালন করছে?

(গ) ডুয়ার্সের চা-বাগিচা এলাকা থেকে যেসব শ্রমিক ইউনিয়নের অভিজ্ঞ নেতা টি-বোর্ড বা শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সদস্য হয়েছেন, তাঁদের তরফে কতটুকু শ্রমিক কল্যাণ ঘটেছে, তা কি বন্ধ ও অচল চা-বাগানের বুভুক্ষু শ্রমিক ঠাহর করতে পারে?

(ঘ) এই এলাকা থেকে নির্বাচিত সাংসদরা দেশের সংসদে ডুয়ার্সের চা-বাগানের অনাহারক্লিষ্ট চা-শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল নিয়ে আজ পর্যন্ত ক'বার সরব হয়েছেন? রাজ্য বিধানসভায় এই এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যরা কি একটিও প্রশ্ন তুলেছেন এখনও পর্যন্ত?

দান খয়রাতি কি সমাধানের পথ?

সরকারি উদ্যোগে কয়েকটি চা-বাগানে একশো দিনের কাজ, রেশন ব্যবস্থা, চিকিৎসা ক্যাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা যে হয়েছে তা মানতে হবে। তবে তা যে প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, সে কথাও যে বলতে হবে। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ রেড ব্যাঙ্ক-সহ কয়েকটি বন্ধ চা-বাগান খোলার জন্য আর্থিক প্যাকেজ সমেত আরও কিছু কর্মসূচি নিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা দিয়ে তাদের আমলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ২০১১ সালে

বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফল করতে দায়বদ্ধ কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় ১০০ দিনের কাজ, ইন্দিরা আবাসন যোজনাসহ সমস্ত রকম কর্মসূচি ও সফল প্রকল্প রূপায়নে আমরা দায়বদ্ধ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার দেখানো পথ ধরে এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশে এগিয়ে চলেছে এই পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-পরিবহণ কার্য বিভাগ। বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

ধন্যবাদ সহ—

স্বপন কুমার পাত্র
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১নং ব্লক

খোকন মিঞা
কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত ও পরিবহণ কার্য বিভাগ
কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি।

কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

ধলুয়াবাড়ি, কোচবিহার

রাজ্য সরকারের তিনজন মন্ত্রী ডুয়ার্সের দু'-একটি চা-বাগান দেখে পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করে নানা প্রকল্পের সূচনা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এসবের পরও ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকের মৃত্যুমিছিল থামানো যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে নানা কর্মসূচিরই সূচনা ঘটে। কিন্তু ওইসব প্রকল্প কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে তদারকি করার মতো প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক সরকারি স্তরে নেই। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে দুর্গত মানুষকে দুর্ঘটনার কবল থেকে সরিয়ে এনে আশ্রয় দেওয়া যায়। লঙ্গরখানা খুলে কয়েকদিন খিচুড়ি খাওয়ানো যায়। ত্রাণ দিয়ে সামান্য সাহায্য করা যায়। কিন্তু দুর্যোগের কারণে ওই মানুষগুলোর হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সম্পদ কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়? তাহলে খয়রাতি সাহায্য কিংবা ডোল দিয়ে বন্ধ ও অচল চা-বাগানের বুভুক্ষু শ্রমিক ও তার পরিবারকে দীর্ঘকালের জন্য জীবনদান কীভাবে সম্ভব? নাকি দানখয়রাতি করেই একটি কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাপনাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়?

সমবায়েও মিলতে পারে সাফল্য

ডুয়ার্সের সবেধন শিল্প বাঁচানোর জন্য বিকল্প পথ হিসেবে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি প্রাথমিকভাবে সমবায় সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বললেন, হুট করে বললেই বাঁচানো যায় না। কেন? ওটা নাকি কেন্দ্রীয় ব্যাপার। রাজ্য সরকার বড়জোর চা-বাগানের লিজ বাতিল করতে পারে। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা ব্যবধানে মলয়বাবুর সহকর্মী রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী সমবায় প্রস্তাবে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে নীতি সংক্রান্ত সমন্বয়ের অভাব যদি এতটা প্রকট হয়ে ওঠে, তাহলে কীভাবে সম্ভব কোনও সমস্যা সমাধানের নীতি নির্ধারণ? কীভাবে সম্ভব ডুয়ার্সের চা-বাগানকে বাঁচিয়ে তোলা? আর কে কী পারেন কিংবা পারেন না তা জেনে মুমূর্ষু চা-শ্রমিকদের কী লাভ? একই দলের নেতৃবর্গ, মন্ত্রিসভার সদস্যরা যদি নিজেরাই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মেতে ওঠেন তবে তো ডুয়ার্সের চা-বাগান আর তার শ্রমিকদের অন্তর্জলী যাত্রা যাওয়া ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার থাকে না।

বিগত শতকের সাতের দশকে ডুয়ার্সের অচল সোনালি বাগানকে শ্রমিকরাই সমবায় গড়ে সচল করেছিল। সেই ইতিহাস হয়ত আজ আর মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর স্মরণে নেই। 'এখন ডুয়ার্স'-এর জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যায় সোনালি চা-বাগান শ্রমিকদের সেই আন্দোলন-কথা প্রকাশিত হয়েছে সবিস্তারে। আজ কি এ প্রশ্ন খুব অপ্রাসঙ্গিক, কেন বন্ধ ধরনীপুর চা-বাগানে শুরু হওয়া ক্রেডিট কো-অপারেটিভ গড়ার চিন্তা-ভাবনাকে জায়গা ছাড়া হল না? কেন অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের উজ্জ্বল পরিবেশ পরিলক্ষিত হলেও আমাদের রাজ্যে সমবায়ের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্যত্র প্রশ্ন থাকলেও ডুয়ার্সের মাটিতে সোনালি চা-বাগানের সময় সমবায়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ঘটলেও আইনি জটিলতায় সেই সমবায় প্রকল্পের অস্তিত্ব ইতিহাস হয়ে যায়। উল্লেখ করতে হয়, ১৯৫৬ সালে বাগিচা শিল্পের উপর পি মাধব মেনন কমিটির সমীক্ষা রিপোর্টের। ওই রিপোর্টের অন্যতম সুপারিশ ছিল ছোট বাগানগুলিতে সমবায় গঠনের। তাকে মান্যতা দিয়ে তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে এবং হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায়

ছোট এবং মাঝারি চা-বাগিচাগুলি সমবায় করে চালানোর জন্য রাজ্য সরকার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে সাফল্যও মিলেছিল। কিন্তু এ রাজ্যের কোনও সরকারকে আজ পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল না। পুরনো কাসুন্দি ঘাটাঘাটির দরকার হল সাম্প্রতিক ডুয়ার্সের চা-বাগানে মড়ক লেগেছে বলেই। কিছু আইনি জটিলতা যে আছে তা সেই সময়ে গড়ে ওঠা সমবায় আন্দোলনের পরিণতিই বলে দেয়। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা মানে কি কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কিংবা পারস্পরিক মত পার্থক্যকে প্রায় কাজিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া? বিরোধীদের অভিযোগ তখন সত্যিই যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়, বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের প্রবেশপত্র বিনামূল্যে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়ে অথবা উত্তরবঙ্গ উৎসবে একশোটি ক্লাবকে লক্ষ টাকা করে অনুদান দিলে কি চা-বাগান আর তার শ্রমিকদের বাঁচানো যাবে?

বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার আর তার দল বন্ধ ও রুগ্ন চা-বাগান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এটা বিরোধীদের অপপ্রচার বলে মানলেও বলতে হবে চা-বাগান ইস্যুতে ব্যাক ফুটে রয়েছে তৃণমূল। একদিকে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের জোড়া চাপ, অন্যদিকে রয়েছে শ্রম বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট। ইতিমধ্যে লোকসভাতেও উঠেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে একের পর এক মৃত্যুর প্রসঙ্গ। পেটের খিদে দলমত মানে না। চা-বাগানে বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি দুর্দশায় রয়েছে তৃণমূল সমর্থক শ্রমিকরাও। তারাও ক্ষুব্ধ দল ও সরকারের উপর। শুধু তাই নয়, চা-বাগানের শ্রমিকরা অনাহারে না মরলেও তাদের মৃত্যুর কারণ যে অপুষ্টি সেকথা বলেছেন ফালাকাটার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক। এরকম অবস্থায় শাসক দল কিংবা সরকার নতুন করে কোনও বিতর্ক তৈরি করে বিরোধীদের হাতে প্রচারের অস্ত্র তুলে দেবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক। তা বলে ডুয়ার্সের চা-বাগানের সমস্যা নিয়ে বৈঠক করতে হবে কলকাতায়? আর সে বৈঠকে চা-বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে আসবে তৃণমূল চা-শ্রমিক মহাসংঘের নেতারা। প্রশ্ন তো সেখানেই। তৃণমূলের নিয়ে আসা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাগানের প্রকৃত ছবিটা বোঝা কতটা বাস্তব এ নিয়ে অভিযোগও উঠেছে। তাছাড়া ডুয়ার্সের চা-বাগানের সমস্যার সমাধান সূত্র বের করার বৈঠক কেন ডুয়ার্সের মাটি থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে? কেন সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না ডুয়ার্সের মাটিতে দীর্ঘকাল রাজনীতি করে এসেছেন এমন মানুষেরা কিংবা দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আদৌ কাউকে পাওয়া যাবে বলে আজ ভরসা জাগে না কোনও চা-শ্রমিকের মনে। যে বাগানগুলি এখনও চালু আছে, তাদের চা-শ্রমিকরাও দুরুদুরু বুকে বলে, 'কী হবে ভগবানই জানে।' ডুয়ার্সের চা-বাগানের কান্না ভগবানের কানে পৌঁছেছে কি না বলা কঠিন। তবে তা সম্প্রতি পৌঁছেছে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কানে। তাঁর সাম্প্রতিক ডুয়ার্স সফরে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর পৌঁছে দিয়েছেন ডুয়ার্সের কয়েকজন নেতা।

রাষ্ট্রপতি উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ না নিলে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। দেশের রাষ্ট্রপতি যখন চা-শ্রমিকদের দুর্দশায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তখন কি নতুন কোনও সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে? একমাত্র সময়ই দিতে পারে তার উত্তর। ততদিন ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকের নিয়তি ভগবানেরই হাতে।

তপন মল্লিক চৌধুরী

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির মানুষ হলেও জীবন ধারাভাষ্যে এসে পড়ে এমন সব মানুষ আর ঘটনা যা রাজনীতির চেয়েও উৎসাহব্যাঞ্জক। প্রত্যন্ত ডুয়ার্স থেকে দিল্লির দরবারে পৌঁছনোর দীর্ঘ পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ধারাবাহিক স্কেচ।

১

আমার শৈশব কেটেছে আলিপুরদুয়ার জংশনে। সেই ছোটবেলায় রেল কলোনিতে বড় হওয়া আর তার টুকরো টুকরো স্মৃতি। সেসব আজ রোমন্থন করতে গিয়ে মনে আসছে যে, বাবা রেলের মজদুর ইউনিয়ন করতেন। বাড়িতে ইউনিয়নের লোকজন আসত। একটা ঘরে রাখা থাকত ইউনিয়নের ঝান্ডা-চোঙা। ছেলেবেলায় সেই চোঙাগুলো নিয়ে আমরা খেলতাম। মুখে চোঙা লাগিয়ে ইউনিয়নের স্লোগানগুলো অনুকরণ করে চিৎকার করতাম— 'মজদুর ইউনিয়ন করে পুকার/ ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' এটা সেই সময়, যখন রেল কলোনিতেই আমার ছোট্ট জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম যে, তখন বাবার চাকরি ছিল না। আমার বেশ মনে আছে যে, ওই সময় একবার দুর্গা পুজোয় আমাদের নতুন জামাকাপড় হয়নি। সে বছর খুব তারাবাতি জ্বালানোর ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তা কেনারও ক্ষমতা ছিল না তখন।

আমার সেই শিশুবেলায় বাবা কেন কর্মহীন ছিলেন তা অবশ্য পরে জেনেছি। রেলের মজদুরদের ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বাবা এন.এফ. রেলের জেনারেল ম্যানেজারের রোষানলে পড়ছিলেন। বাবাকে জব্দ করার জন্য তিনি বদলির আদেশ দেন। আলিপুরদুয়ার থেকে বদলি করিয়ে বাবাকে পোস্টিং দেওয়া হল লামডিঙে। যথারীতি বাবা লামডিং যেতে অস্বীকার করেছিলেন। এর পর রেল দপ্তর বাবার চাকরি কেড়ে নিতে আর দ্বিধা করেনি। তাই আমার শৈশবের গোড়ার দিকটা কেটেছিল বাবার কর্মহীন দশায়। একরকম দারিদ্রের আবহাওয়াতেই আমার বাল্যকাল কেটেছে বলা যায়। আমার এক জেঠু সেবার আমাকে তারাবাতি কেনার জন্য পয়সা দিয়েছিলেন, কিন্তু জামাকাপড় দেবার মতো উদারতা দেখাতে না পারার কারণে সে বছর নতুন জামা পরা হয়নি পুজোয়।

এর পর অবশ্য অবস্থা একটু বদলায়। আলিপুরদুয়ার রেল কলোনিতে বাবার যাঁরা সহকর্মী ছিলেন, তাঁরা এগিয়ে এলেন। তাঁদের সহযোগিতায় বাবা রেলওয়ে ইনশিয়োরেন্সের এজেন্সি নিলেন। তাঁর সহকর্মী আর বন্ধুরা বাবাকে প্রথম বছর এতটাই ব্যবসা দিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বছরেই বাবা এজেন্ট থেকে ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পদে উন্নীত হলেন। ডি.ও. হয়ে তাঁর পোস্টিং হল মজফ্ফরপুরে। সেখানে রেলওয়ে ইনশিয়োরেন্সের অফিস চালু হবে। বাবার হাতেই তা চালু করার দায়িত্ব পড়ল।

মজফ্ফরপুরে আমরা একটু সুখের ঝলকানি দেখলাম। ইনশিয়োরেন্সের অফিস ছিল একটা সাত কামরার বাড়ি। দুটো ঘর লাগত অফিসের জন্য। বাকি পাঁচটা ঘর আমাদের দখলে। আলিপুরের রেল কোয়ার্টারের তুলনায় অনেক প্রশস্ত আর খোলামেলা। যেখানে অফিস ছিল, সে জায়গাটার নাম মতিঝিল। মতিঝিলের কিছু কিছু স্মৃতি মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে।

আমরা থাকতাম স্টেশনের পাশে। সেখানে লম্বা লম্বা মালগাড়ি বোঝাই হয়ে আখ আসত। মজফ্ফরপুর ছিল আখের ঘাঁটি। আমার মেজদা চিরকালই একটু ডানপিটে আর দুষ্টু ছিল। অত আখ দেখে সে খুব তাড়াতাড়ি স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে একটা দল বানিয়ে ফেলে। দলটার কাজ ছিল বোঝাই ওয়াগনগুলো থেকে আখ চুরি করা। একটা ছবি চোখে ভাসছে— এপারে আমি আখ খাব বলে দাঁড়িয়ে আছি আর ওপারে দাদাকে তাড়া করেছে রেলের লোক। দাদা একটা ফেন্সিং গলে পালিয়ে যাচ্ছে।

মতিঝিলে থাকতে বড়দিন উপলক্ষে কেক কাটা, ক্রিসমাস পালন করা, চার্চে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রথমবার। এর কারণ, আমাদের বাড়িওয়ালা ছিলেন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তাঁর নাম উইলিয়াম জোন্স। মজফ্ফরপুরে একটা খুব সুন্দর চার্চ ছিল। তবে আমি তখনও প্রথাগত শিক্ষার আওতায় এসে পড়িনি।

কিন্তু বেশি দিন থাকা হয়নি মজফ্ফরপুরে। এগারো মাসের মাথায় বাবার আবার বদলির খবর এল। প্রথমে জানা গিয়েছিল যে, তাঁকে দিল্লি পাঠানো হবে। কিছুদিন পরে খবর এল যে দিল্লি নয়, তাঁকে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জংশনেই।

আলিপুরদুয়ারে দ্বিতীয় দফায় এসে কিন্তু আর রেল কলোনিতে ওঠা হল না। কারণ রেলওয়ে ইনশিয়োরেন্স ছিল একটা আলাদা কোম্পানি। রেলের আবাসন আর পাওয়া গেল না সেই কারণে। ফলে, আমরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে এলাম চেচাখাতায়। সেখান থেকে রেলের স্কুল দূরে নয়। আমাকে সেখানে ক্লাস টু-তে ভরতি করা হল। কিন্তু ভরতি হওয়ার পর স্কুলের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা অনুরাগ দেখা যাচ্ছিল না। স্কুলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার। আমি স্কুলে যাচ্ছি না দেখে অতঃপর মা

আলিপুরদুয়ার জংশন

প্রহারধর্মের আশ্রয় নিলেন। আমি অচিরেই বুঝতে পারলাম যে, মায়ের প্রহারের তুলনায় স্কুলটাই অনেক আরামের হবে। স্কুলে যাওয়ায় মতি হল তখন।

কিন্তু সমস্যা হল অন্যত্র। ততদিনে স্কুলে ক্লাস টু-তে আর কোনও সিট নেই। সমস্যার সমাধান হল আমার জ্যাঠতুতো দিদির দ্বারা। তিনি ছিলেন ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। তাঁর প্রশ্রয়ে আমি ভরতি হলাম ক্লাস থ্রি-তে। আমার আর টু-তে পড়া হল না, বরং সেই ক্লাসে ভরতি হওয়ার এক মাসের মাথায়, কোনও পরীক্ষা না দিয়েই আমি উঠে গেলাম থ্রি-তে!

আলিপুর জংশনের ওই সময়টা আমার কিছু কিছু বেশ মনে আছে। আমারা সব ভাই তখন জন্মে গিয়েছি। বোনের জন্ম হয়নি। ও পরে হয়েছিল। কোচবিহারে। ফোর থেকে ফাইভে ওঠার সময় আমরা বদলি হয়ে এলাম কোচবিহারে। এটা ১৯৫৯ সাল। আলিপুরে আমার দশ বছর কেটেছিল। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯। এর মধ্যে অবশ্য একটা ব্যাপারও ঘটেছিল। সেটা হল, ১৯৫৬ সালে বিমা কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ। রেলওয়ে ইনশিয়োরেন্স, ওরিয়েন্টাল ইনশিয়োরেন্স প্রভৃতি সব পরিণত হয়েছে লাইফ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি অব ইন্ডিয়ায়। বাবা কোচবিহার লাইফ ইনশিয়োরেন্সের অফিসে যোগ দিলেন। কিন্তু তখন তিনি আর ডি.ও. নন। কোচবিহারের তিনি যোগ দিলেন হেডক্লার্ক হিসেবে।

পরের পাঁচ বছর ছিলাম কোচবিহারে। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন অবধি। কিন্তু একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কী কারণে আমি আজকের এই রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে কিছুটা হলেও পরিচিতি অর্জন করলাম, তার একটা উত্তর ওই আলিপুরদুয়ার জংশনের দশ বছরের জীবনের একটি ঘটনায় লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। নানা কাজে বাবাকে মাঝে মাঝেই কলকাতা যেতে হত। প্রতিবারই তিনি কোনও না কোনও ভাইকে নিয়ে যেতেন। আমাকে একবারও যেতে বলতেন না। একবার তিনি কলকাতায় যাবেন বলে ঠিক হয়েছে। রাতে সে নিয়ে মা-বাবার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমি শুয়ে শুয়ে তা শুনছিলাম। আলোচনার মধ্যে মা একবার বললেন, 'মিহিরও ঘুরে এল, বাবলুও ঘুরে এল। এবার তুমি কলকাতায় মিঠুকে নিয়ে যাও না!'

নাম দুটো আমার বড়দা আর মেজদার। আমি আশান্বিত হলাম এই ভেবে যে, এবার বোধহয় আমার পালা! কিন্তু বাবাকে তখনই বলতে শুনলাম, 'না না! ওর মতো একটা গবেটকে নিয়ে আমি কোথাও যেতে চাই না! গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?'

আমার বেশ মনে আছে যে, বাবার মুখে 'ওর মতো একটা গবেট' কথাটি শুনে আমি সে রাতে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেঁদেছিলাম। সে বয়সে কথাটা খুব বেজেছিল। আমার সম্পর্কে পিতৃদেবের ধারণাটি আমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার পর হয়ত মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনার মতো একটা জেদ তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল যে পিতৃদত্ত 'গবেট' উপাধির একটা জোর প্রতিবাদ জীবনে রাখতে হবে। কে জানে, ওই 'গবেটত্ব' ত্যাগ করার ইচ্ছেতেই হয়ত আজকের এই জীবনে এসে উপনীত হয়েছি। বলছি না যে এটাই কারণ। কিন্তু সেটা একটা শর্ত ছিল বলে আজ মনে হয়।

কোচবিহারে এসে খেলাধুলায় মাতলাম। ফুটবলে খুব আগ্রহ। খেলতাম অবশ্য গোলে। খেলার প্রতি প্রবল আকর্ষণের তিলমাত্র অবশ্য লেখাপড়ার প্রতি দেখা যাচ্ছিল না। ওতেও যে মন দিতে হয়, তা ধারণাতে ছিল বলে মনে হয় না। ক্লাসে প্রথম সারির বেঞ্চির প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। শেষের দিকের বেঞ্চিগুলোকেই মনে হত বেশি রোমাঞ্চকর। বস্তুত, লেখাপড়াতেও যে মনোযোগ দেওয়া দরকার, সেটা মনে হয়েছিল পরে। আমি তখন নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে পড়ছি। ওই স্কুলের নলিনীবাবুর একটা মন্তব্য আমাকে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।

নলিনী স্যার বলেছিলেন, 'মিঠু যদি পাশ করে বেরয়, তবে আমি হাতে চুড়ি পরব।'

(ক্রমশ)

ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ধূপগুড়ি পৌরসভা

নতুন বছরের শুভারম্ভে ধূপগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে পুরবাসীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পুর নাগরিকদের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়নকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নতুন বছরে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে—

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মায়ের থান থেকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত ফালাকাটা রোডের চার কিলোমিটার ওয়েন ওয়ে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু।

দক্ষিণায়ন ক্লাবের দান করা জমিতে ইকো পার্কের কাজ শুরু বছরের শুরুতে। থাকবে বোটিং, টয় ট্রেনসহ বিনোদনমূলক ব্যবস্থা।

শীঘ্রই শুরু হবে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের কাজ। চলছে রিজার্ভার তৈরি ও পাইপ লাইন বসানোর কাজ।

দীর্ঘকাল অনুন্নয়ন ও পুর পরিষেবার অবহেলায় ভেঙে পড়েছিল ধূপগুড়ি পুর ব্যবস্থা। এক দিকে অনুন্নয়ন অন্য দিকে সংস্কার না হওয়ার ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ধূপগুড়ি পুর এলাকা। উন্নয়নমূলক কোনও প্রকল্প না থাকায় সংস্কার হয়নি পথঘাট, নিকাশী, জলাধার থেকে শুরু করে পানীয় জল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার। নতুন পৌরসভা প্রত্যন্ত এলাকার পথঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, খাল-বিল-পুকুরসহ জলাশয়গুলির সংস্কার, নতুন করে বাঁধ নির্মাণ, পাকা রাস্তা, ড্রেন ও সেতু তৈরিসহ বহু কাজে উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখছে। এখন ওই পুর এলাকায় একজন বহিরাগত এসে চোখ রাখলেও বুঝতে পারেন উন্নয়ন আর সংস্কারে কতটা বদলে গিয়েছে ধূপগুড়ি।

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ্য, কুমলাই ও বামনি নদীর উপর আটটি ব্রিজ, রাস্তা চওড়া করা, ১০টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কুমলাই ড্যাম মেরামত, শ্মশানঘাট মেরামত, নতুন পৌরসভা ভবন নির্মাণ, এরকম আরও অনেক।

অরূপ দে
ভাইস চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

শৈলেন চন্দ্র রায়
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

ডুয়ার্সের ঘাসফুল জমিতে বেনো জলের সংক্রমণ ঘটেছিল মুকুলের হাতেই

‘অজ্ঞাতবাস’-এর সমাপ্তি শেষে তাঁর মূলস্রোতে ফেরার সম্ভাবনা উদ্‌যাপিত হচ্ছে দলের উপরমহলে। যাঁরা অ্যাদ্দিন তাঁর ছায়া এড়াতে ঝটিতি বিমান বদল কিংবা সভাকক্ষ ত্যাগ করতেন, তাঁরা আবার দন্ত বিকশিত করে সেই ‘অস্পৃশ্য’কেই জড়িয়ে ধরছেন কোনও এক অদৃশ্য মহিমায়। বছরখানেক এ রাজ্যের মিডিয়ার ‘খাদ্য’ জুটিয়েছে যে ক্রমাগত দুর্বোধ্য মোনালিসা-হাসি, সেই হাসি এখন ঠোঁটের কোণ থেকে ফের আকর্ণ বিস্তৃত হয়েছে। বছরখানেকের ‘মিশন’ সেরে তিনি আবার ঘরে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও অনেকেই কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারছেন না। তাঁর এই নাটকীয় প্রত্যাবর্তন ডুয়ার্স বা উত্তরবঙ্গে দলের পুরানো ও নব্য দুই মহলেই যেমন আলোড়ন তুলে দিয়েছে, তেমনই বঙ্গীয় হিমালয়ের পাদদেশে ঘাসফুলের দ্রুততম বিস্তার যে যথার্থ চাষের ফলন নয়, তাও সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আসন্ন ভোট বৈতরণি পার হতে গেলে তাঁর পুরানো শিবিরে থাকাটা হয়ত জরুরি, কিন্তু তরতাজা দলটিতে যে রোগ সংক্রমণের সূচনা একদা তাঁর হাতেই হয়েছিল, তার থেকে সৃষ্ট পচন রোধের দাওয়াই বোধ করি এই ‘আশ্চর্য নেতা’জির কাছে মিলবে না!

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূল গঠনের সময় মুকুল রায় দলনেত্রীর পাশে ছিলেন, যদিও প্রতিবাদের চেতনায় ক্রুশবিদ্ধ হতেও দ্বিধা না করা আর পাশে থাকা এক জিনিস নয়। সমস্যাটা তৈরি হল ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা থেকেই। আর এই সমস্যা গুরুতর অসুখে পরিণত হল ক্ষমতায় আসার পরে।

একদা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল জনগণের আন্দোলনের রথে চড়ে। প্রথম দিকে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, পরবর্তী দু’দশকে সেই জনতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ল ক্ষমতার প্রসাদভোগী ‘আগত নতুন’ কমরেডদের উপর। সেইসব ক্ষমতাভোগী নতুন কমরেডের স্রোতের মধ্যেই তারা তাদের সংগঠন বৃদ্ধির উর্বর পলিমাটি বলে খুঁজে নিয়েছিল। সেই পাঁকের স্রোতে ভেসে আসা বিষাক্ত আগাছা যেমন ভাল ফসলকে ধ্বংস করে, তেমনি ক্ষমতার আবর্তে দলে দলে আসা এই নতুন সদস্যরা যে কোনও সংগঠনকেই আগাছায় ভরিয়ে দেয়। মুকুলবাবু কিন্তু সিপিএমের আজকের এই করুণ পরিণতি দেখেও শিক্ষা নেননি।

বরং পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হবার উন্মাদনায় তৃণমূলের ভাঁড়ারঘর ভরাতে সেই একই বেনো জলের পাঁকে সংগঠনের তরি ভাসাতে শুরু করেছিলেন। সংগঠনের সর্বত্রই মুকুলের মুকুলিত গুচ্ছ, মুকুলের কাছে যেতে পারলেই ক্ষমতার উত্তাপ। মমতার জনপ্রিয়তা আর মুকুলের সুবাস তৃণমূলকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলেও দলের মধ্যে পুরানো তৃণমূল আর নব্য তৃণমূলের লড়াইয়ের আত্মঘাতী ঢেউ মমতার দরবারে পৌঁছাতে খানিক সময় নিলেও শেষ অব্দি পৌঁছয়। কারণ, তখন তো সর্বত্র মুকুলের মুকুলিত ক্ষমতার অমোঘ টানে নিত্যনতুন দলছুটদের তৃণমূলের মেদ বৃদ্ধির স্বাস্থ্যের প্রতিফলন। কিন্তু মমতাকে যদি কেউ মনে করে, তিনি শুধু আবেগসর্বস্ব রাজনৈতিক, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাহীন, তবে খুব ভুল করবেন। মমতা তাঁর ব্যক্তিগত সাহস এবং নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন এই সংগঠন। সেই সংগঠনের উপর তাঁর একচ্ছত্র অধিকার কোনওভাবেই যে খর্ব করার ঝুঁকি নিতে রাজি নন মমতা, তার প্রমাণ দিলেন নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সংগঠনের শীর্ষে এনে। মুকুল রায় অভিমানে বা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেল মন্ত্রী থাকাকালীন। সেই সময়ে ওঠা দুর্নীতির দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে বলে দিলেন, ‘আমার সময় ঘটেনি।’ সে সময়েই ফাঁস হল সারদা কেলেঙ্কারি।

মুকুলবাবু অতি সাবধানী রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি মমতা নন। জলে নামার আগে জলের গভীরতা তিনি যে বারবার মেপে চলেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি এটাও জানেন, যাদের তিনি নানা ক্ষমতার টোপ দিয়ে অন্য দল থেকে তৃণমূলে ডেকে এনেছিলেন, সেই সুবিধাপ্রত্যাশীদের আরও বেশি সুবিধার নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলে তারা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে তাঁর নতুন দলে যোগ দেবে না।

উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতেও মুকুলবাবু একইভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা জেলাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এইসব জেলায় তৃণমূলের সংগঠন বলতে কিছু ছিল না। অন্য দল থেকে আসা

দলের সংকটের সময় নিজেকে সরিয়ে গুটিয়ে রেখে যাবতীয় জল্পনার সৃষ্টি করে ‘ফোকাস’ ঘুরিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন মুকুল। এ ব্যাপারে সবাই একমত। তেমনই তাঁর নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় উত্তরবঙ্গের মাটিতে ‘বহিরাগত’ সুযোগসন্ধানীদের বাড়বাড়ন্ত বহু জায়গাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতাপ লঘু হয়ে গিয়েছে সেইসব স্বার্থান্বেষীর, যারা সবসময় ক্ষমতার বৃত্তের কাছাকাছি থাকার কৌশল জানে। ছোটবড় অনেক পুরানো তৃণমূলিকেই ফের দেখা গেছে পথেঘাটে সদর্পে হাঁটতে।

রাজনৈতিক গাড়ি বদলের সংখ্যাই বেশি। মুকুলবাবুর সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরে উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট, এইসব গাড়ি বদলকারী কতজন তাঁর নতুন গাড়ির প্যাসেঞ্জার হতে রাজি হবেন কি না। যাদের তিনি অন্য দল থেকে পদত্যাগ করিয়ে তৃণমূলে এনে বিভিন্ন পদে বসিয়েছিলেন, তাঁরা তো এসেছিলেন স্রেফ ক্ষমতার স্বাদে। কেউ আদর্শের তাগিদে এখানে আসেননি। অথচ এবারের মুকুলবাবুর উত্তরবঙ্গ সফরের সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করেছেন বা যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দলের বঞ্চিত পুরানো কর্মী বা নেতা। নতুন যাঁরা মুকুলবাবুর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউই তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করেননি। এঁদের অনেকেই অপেক্ষা করছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা কতটুকু সুবিধা পাবেন, তার জন্য।

দল থেকে কাউকে অপসারণ বা বহিষ্কারের চাইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি আস্থা রাখেন সেই ব্যক্তির সঙ্গে দলের যাবতীয় সংস্রব বন্ধ রাখায়। সারদা কেলেঙ্কারির ভয়াবহ রূপ তাঁকে সাবধানী করেছিল, সংগঠনের চাবি মুকুলের হাত থেকে নিয়ে নেওয়ার লাল ওয়ার্নিং দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত স্তর থেকে কর্তৃত্বের রাশ মুকুলের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে যে ভুল করেছিলেন তা সংশোধনের জন্য মুকুলের সঙ্গে তিনি অহিংস নির্ঝঞ্ঝাট বোঝাপড়ায় গিয়েছিলেন। আর মুকুল তা গ্রহণ করেছিলেন এক রকমের ‘মিশন’ হিসেবে। দীর্ঘ অসীম ধৈর্যের পরীক্ষার অবসানে তিনি উতরে গেছেন, বলাই বাহুল্য। এই সুযোগে নেত্রীও এলোমেলো ঘর কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছেন।

দলের সংকটের সময় নিজেকে সরিয়ে গুটিয়ে রেখে যাবতীয় জল্পনার সৃষ্টি করে ‘ফোকাস’ ঘুরিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন মুকুল। এ ব্যাপারে সবাই একমত। তেমনই তাঁর নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় উত্তরবঙ্গের মাটিতে ‘বহিরাগত’ সুযোগসন্ধানীদের বাড়বাড়ন্ত বহু জায়গাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতাপ লঘু হয়ে গিয়েছে সেইসব স্বার্থান্বেষীর, যারা সবসময় ক্ষমতার বৃত্তের কাছাকাছি থাকার কৌশল জানে। ছোটবড় অনেক পুরানো তৃণমূলিকেই ফের দেখা গেছে পথেঘাটে সদর্পে হাঁটতে। ক্ষমতা যেটুকুই থাক, দল ক্ষমতায় আসার পর প্রাপ্য সম্ভ্রমটুকু ফিরে পাওয়ার আনন্দে। মন হালকা হলেও তাদের অনেকেরই তবু সংশয় ছিল।

মুকুলের রাতারাতি এভাবে সরে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না তাদের কাছে। কিন্তু ক্ষমতার সূচনাতেই বেনো জলের তোড়ে দলের যা ক্ষতি হয়েছিল, তাতে মেরামতির সুযোগ যে যথেষ্ট কম তা বুঝতে পেরেছিলেন এইসব তৃণমূল স্তরের নেতা। তাঁদের মতে, যে সংক্রমণের দ্বার মুকুল খুলে দিয়েছিলেন, দলের পক্ষে তারই ভয়াবহতম পরিণাম হল উদয়ন গুহদের মতো বাম নেতাদের অনুপ্রবেশ, যা সাধারণ মানুষের চোখে ভীষণ ‘বেমানান’ এবং গ্রহণযোগ্য নয়। একটা সময় বেনো জলের সংক্রমণে দল মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছিল অতি দ্রুত হারে—এই সত্য উপলব্ধি করার পর শুদ্ধিকরণের হাজার পন্থা নিয়েও সর্বনাশ ঠেকাতে পারেনি বামেরা। মুকুলের প্রত্যাবর্তন, হোক বা না হোক, কিংবা হলেও দলে তাঁর নতুন ভূমিকা যা-ই হোক না কেন, মানুষের বিশ্বাস কিংবা পুরানো দলীয় কর্মীদের আস্থা পুনরুদ্ধারের পথ কি তাঁর জানা আছে?

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

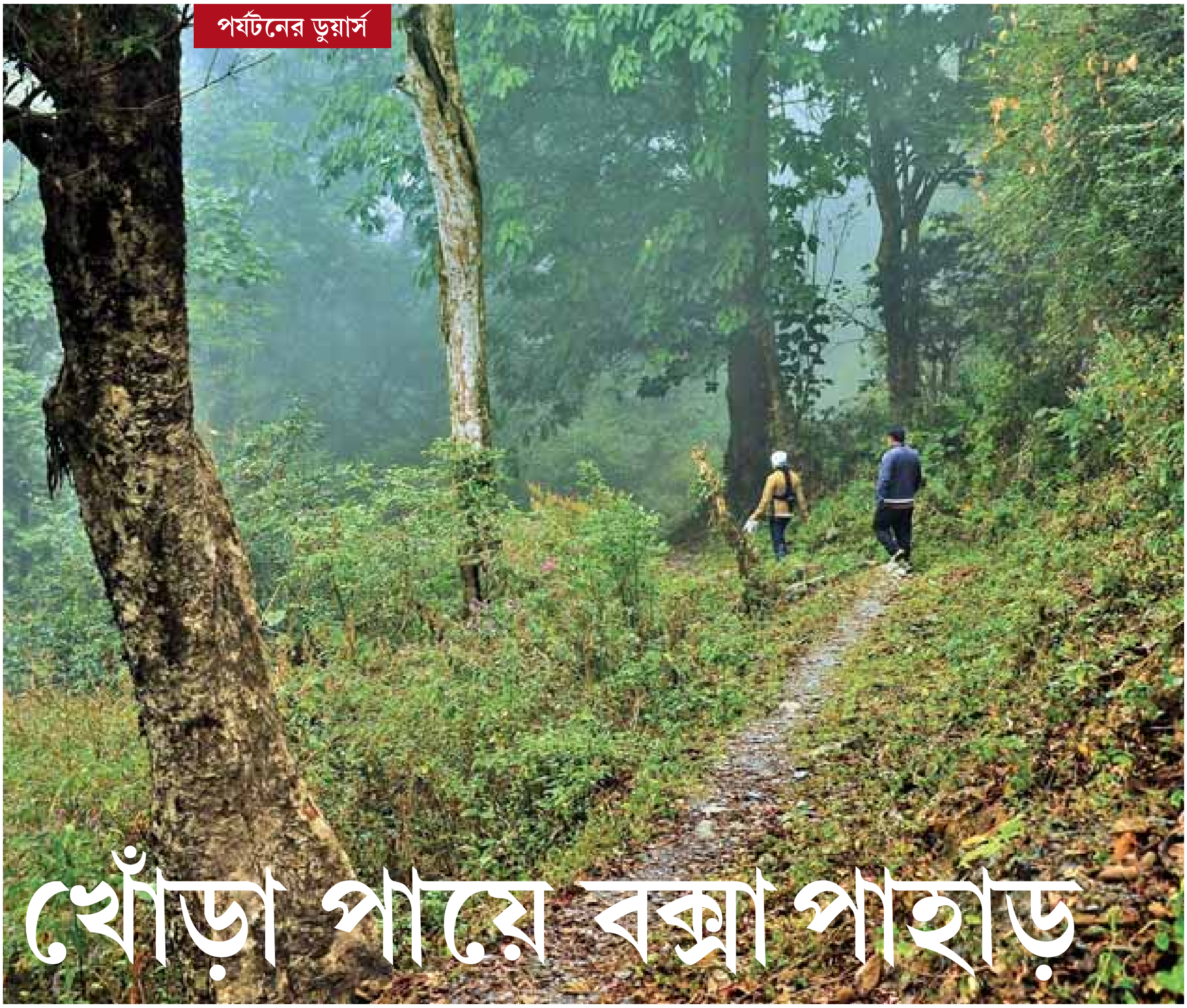

খোঁড়া পায়ে বক্সা পাহাড়

চণ্ডীদাসের উপলব্ধি যে কবির অনুভব। সে সত্য যে পরম সত্য, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' নয়ত যে মানুষের কপালে বিধাতা বর্জনের ছাপ অলরেডি মেরে দিয়েছেন, সে তার জীবনের শেষ রসটুকু নিংড়ে বর্জনের ছাপ তুলে ফেলে অসীম মানসিক শক্তির জয়টিকা এঁকে দিল কী করে?

দুপুরে বিছানায় গড়াচ্ছি, হঠাৎ ফোন, 'দীপিকাদি, আপনার বয়স কত?' রথীনের গলা, আমাদের 'ট্র্যাভেল রাইটারস' ফোরাম'-এর সেক্রেটারি। ভাবি, ব্যাপার কী? আজকাল নাকি বয়স কোনও ব্যাপার নয়, বিয়ে-টিয়ে দেবে নাকি আমার? একটু কি পুলকিত হলাম? বলি, 'ছিয়াত্তর, কেন রে?' কোনও উত্তর নেই, ফোন সুইচ অফ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। আমিই ফোন করি— নট রিচেবল। অগত্যা ফোরামের অন্য এক সদস্য দেবাশিসকে ফোন করলাম। সে বলল, 'রথীন আপনাকে কিছু জানায়নি, টিকিট কাটার জন্য আপনার বয়স জিজ্ঞেস করছিল, আমিও সঙ্গে ছিলাম। এবার ফোরামের সদস্যরা তো বক্সা পাহাড়ে ফোটোগ্রাফির ক্যাম্প করতে যাচ্ছে, সঙ্গে আপনাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, তাই তো বলেছে।' বক্সা পাহাড়ে ২৫ বছর আগে গিয়েছিলাম, সেখানে তো হেঁটে উঠতে হয়। তাড়াতাড়ি বলি, 'সান্ত্রাবাড়ি থেকে বক্সা পাহাড়ে এখন গাড়ি যাচ্ছে তাহলে?' দেবাশিস বলে, 'না না, সান্ত্রাবাড়ি থেকে গাড়ি পুরোটা যায় না, দু'কিমি মতো পথ গাড়ি যেতে পারে না, হেঁটে উঠতে হয়।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি, 'সে কী রে! আমার পায়ের এই অবস্থা, প্লেন রাস্তাতেই দশ পা চলতেপারি না, পাহাড়ি পথে—' দেবাশিস বলে, 'জানি না দিদি, রথীন বুঝবে, ওকে বলুন।' আমার তো মাথায় হাত। বয়সের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু পায়ের যা অবস্থা— চার বছর আগে রাস্তায় পড়ে গিয়ে শুধু কোমরের ফিমার বোন আর বলবেয়ারিংই ভাঙেনি, স্পাইনাল কর্ডে প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলে বাঁ পা-টা একরকম প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটার কোনও সাড় নেই, সর্বক্ষণ পায়ে ঝিঁঝি ধরে থাকে, কোনওরকমে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো পা টেনে টেনে চলা, তাও ঘরের মধ্যে। আমায় নাকি বক্সা পাহাড়ে তুলবে রথীন! কে জানে কার মাথা খারাপ হয়েছে— আমার না ওর!

যাবার আগের দিন এই ব্যাপারে মিটিং ডাকা হয়েছিল। বারে বারে আমার অপারগতার কথা বললাম। বেশির ভাগ সদস্য-সদস্যাই সমস্যা বুঝে অবাক চোখে তাকালেন। ভাবখানা— রথীনের গোঁয়ারতুমির সাজা রথীন পাবে, তখন বুঝবে, আমাদের কী? একমাত্র অসীম আমার হাত ধরে বলল, 'চিন্তা করবেন না দিদি। আমরা রেগুলার পাহাড়ে চড়ি, দলের কারও কোনও অসুবিধা হলে অর্থাৎ হঠাৎ আঘাত পেয়ে চলতে না পারলে কাঁধে করে নিয়ে যাই, আপনাকে না হয় কাঁধে করেই নিয়ে যাব। তবে নিয়ে যাবই।' অতএব—

ট্রেন, মোটর সবরকম যানবাহনের পথ পেরিয়ে সান্ত্রাবাড়ি পৌঁছালাম। না, পঁচিশ বছরে বিশেষ কিছু পালটায়নি জায়গাটা। কেবল পথে বসা সওদা, দোকান স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ দোকান হয়েছে দু'-চারটে, আর যুগের সঙ্গে সওদারও রকমফের হয়েছে। যা-ই হোক, গাড়ি

আরও কিছুটা পথ এগয়। আগের বার বুক ভরে ছিল উৎফুল্লতায়, মুখে ছিল হাসি, চোখে ছিল কৌতূহল। এবার ভয়ে বুক কম্পমান, মুখের হাসি লোপাট, চক্ষু আশঙ্কায় ছল ছল। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। অভ্যাসবশত প্রকৃতির দিকে তাকাই। চারদিকের ঝরে পড়া সৌন্দর্যে মন ভরে ওঠে, ভুলে যাই নিজের অবস্থার কথা। পাহাড়ি পথের দু'ধারে নিঃসঙ্গ সবুজ বিস্তার, মাথার উপর পলিউশনহীন নীলকান্তমণির মতো ঝকঝকে আকাশ, তাতে সূর্যদেব প্রচুর পরিমাণে রোদের সোনা ঠেলে দিয়েছেন, উজ্জ্বলতায় মন জড়তা ভুলে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। অসীম বলে, 'দিদি নামতে হবে, এবার হাঁটা-পথ।' মুহূর্তে নিজের অবস্থায় ফিরে আসি, ভয়ে ভয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। আমার আজীবনের প্রিয় এবং পরিচিত পাহাড়ি পথে। দেখি, সামনেই ছোটবড় বোল্ডারের পথ খাড়াই উঠে গিয়েছে উপর দিকে। চোখের সামনে থেকে পথ সরে গিয়ে সেখানে স্থান নিল সরষে ফুলের হলুদ বর্ণ। চকিতে মাথাটা যেন ঘুরে গেল। কিন্তু না, অনেক ট্রেক করেছি, জীবনের শেষ ট্রেকে হারলে চলবে না, শক্তি তো আসলে মনের, শক্ত করে লাঠিটা ধরে অগ্রসর হলাম। পা মাঝে মাঝে টলে যাচ্ছে। অচিন্ত্যভাই শক্ত করে হাত ধরল। মনে মনে বললাম, হাঁটা থামাব না কিছুতেই, আস্তে আস্তে চলে ঠিক পৌঁছাবই। এঁকেবেঁকে কোনওরকমে পা ফেলছি। অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়ালেই চারদিকের সৌন্দর্য চলার জন্য আগ্রহী করে তুলছে। আকাশের দিকে তাকালেই মনে পথ চলার ইচ্ছে অনুভব করছি। হেমন্তের আকাশ, উজ্জ্বল নীল রং, হলুদ রোদের আভায় মনোরম আবেগের সৃষ্টি করছে। চলার কষ্ট অনুভব করছি না একটুও। আর আছে প্রজাপতিদের ছোটাছুটি। সারা পথে নানা রঙের ডানা মেলে অসংখ্য প্রজাপতি কখনও পথের ধারের গাছে বসছে, কখনও উড়ে চলেছে। বর্ষা শেষ, উত্তুরে বাতাসও শুরু হয়নি, তাই বৃষ্টি-ধোয়া চারপাশের চকচকে সবুজ ধুলোর পাউডার মাখেনি এখনও। আর ভাগ্যি এখনও এ পথে গাড়ি চলাচল শুরু হয়নি। এখানকার বসতির সামান্য কয়েকজন বাসিন্দা ছাড়া লোক চলাচল নেই। শহুরে লোক কিছু বেড়াতে বা ট্রেক করতে এলেও এখানকার আনটাচড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণই রয়েছে।

অচিন্ত্য বলে, 'একটু দাঁড়ান দিদি।' দূরে আঙুল নির্দেশ করে বলে, 'দেখুন, সোজা খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। ওর উপরে যে টেবলটপের মতো জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত বক্সা ফোর্ট, ভাল করে খেয়াল করলে একটা স্ট্রাকচারের আভাস পাওয়া যাবে।' হ্যাঁ, দেখতে পেলাম বটে। মনে পড়ে গেল, প্রথমবারও এখান থেকেই গাইড ফোর্টের অবস্থান দেখিয়েছিল বটে। পুরোপুরি কখনওই থামছি না কিন্তু, টুকটুক করে এগিয়েই চলেছি। এবার পথের ধারে চায়ের দোকান এবং একটা-দুটো গ্রামের ঘরবাড়িও চোখে পড়ল, মনে হল মোটামুটি পৌঁছে গিয়েছি। পথের ধারে পয়েন্টেসিয়া গাছের বেড়া, টুকটুকে আলতা রঙের ফুলের গুচ্ছ নিমেষে পথের ক্লান্তি দূর করে দিল। সব মিলিয়ে চারদিক বড় উজ্জ্বল, মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সামান্য পথ, ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম আমাদের হোমস্টে-র দরজায়। দলের সব থেকে খুদে সদস্য আট বছরের ঐন্দ্রি পয়েন্টেসিয়া ফুল দিয়ে আমায় স্বাগত জানায়, দলের সকলে তার পিছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি আমায় চেয়ারে বসিয়ে হাতে গরম চায়ের কাপ ধরিয়ে দেয়। হাতঘড়িতে দেখলাম ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছে। মনে মনে বললাম, পেরেছি, আমি পেরেছি।

লাঞ্চ খেয়ে সামান্য বিশ্রামের পর কিছুটা উপরে উঠে বক্সা ফোর্ট দেখে এলাম, আগের থেকে আরও ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রসঙ্গত জানাই, ১৮৬৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ভুটিয়াদের হারিয়ে সিঞ্চুলা চুক্তিমতো বছরে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বক্সা গিরি তথা দুর্গের দখল নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজ। পরে ১৯৩০ সালে এই দুর্গের সংস্কার করে বন্দিশিবির গড়ে ত্রৈলোক্য মহারাজ, ভূপেন দত্ত, হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, নিকুঞ্জ সেন প্রমুখ। অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আটক রাখত ব্রিটিশরাজ এই দুর্গে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিধন্য ঐতিহাসিক এই দুর্গ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। গুটিগুটি ফিরে আসি আমাদের হোমস্টে-তে।

আজ রাসপূর্ণিমার পরের রাত্রি। সন্ধ্যার একটু পরে দূষণহীন পরিচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ উঠলে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভরে যায় চরাচর। ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা হয়েছে বেশ কিছুটা উঁচুতে। আমায় হাত ধরে নিয়ে গেল সকলে মিলে। পাহাড়ি খাঁজে টেবলটপের মতো একটা বিস্তৃত জায়গায় গোল করে বসার জায়গা করাই আছে। মাঝখানে আগুন জ্বালানো হল। আকাশ ফুটে চাঁদের আলো ঝরছে। মন কোন মায়াময় কল্পলোকে উধাও হয়ে যায়। নাচে-গানে এই অবাক রাত্রি স্মৃতির ভাঁড়ারে গভীর মমতায় জমে থাকে।

বক্সা থেকে ফিরে এসে বাংলা আকাদেমিতে একটা সাহিত্যসভায় দেখা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বাণী বসুর সঙ্গে। তিনি আমার শারীরিক অবস্থা দেখে এবং আমার বক্সা যাওয়ার গল্প শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি বক্সায় গেলেন! আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল বক্সা ফোর্ট দেখার, কিন্তু আর সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, আমার পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আপনি তো এই অবস্থাতেও উঠেছেন।' মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

দীপিকা ভট্টাচার্য

ছবি ঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

তরাই উৎরাই

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬

আজ বেশ গরম। বাইরে বৈঠকখানার ঘরে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে ঘণ্টা দুয়েক হল। শোভা পাশের ঘরে বসে শুনছিল সেসব আলোচনা। পাশের ঘরটা আসলে বইপত্র রাখার ঘর। শহরে প্রায় সকলেই জানে যে, খুদিদা বেশ আড্ডাবাজ মানুষ। আদালত না থাকলে বিকেলের দিকে একটু কমবয়সিরা গল্প করতে আসে। সন্ধের পরে আসে বয়স্করা। দু'ক্ষেত্রে জলখাবারের বেশ তারতম্য ঘটে। এর প্রধান কারণ অবশ্য বয়স্করা চা-বিস্কুট খেতে চান না। তাঁদের দলে একজন কবিরাজ আছে, যার মতে চা হল বিষ এবং শরীর উত্তপ্ত করে। তবে সর্দি লেগে গেলে নাকি চা পান করা উচিত। কবিরাজের মতে, তাঁর শ্লেষ্মানাশক বটিকার অনুপান হিসেবে চা বেশ কার্যকর। এখন যারা বাবার সঙ্গে গল্পে মেতে আছে, তারা অবশ্য সবাই ছাত্র। তিনজন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। সামনের বার ম্যাট্রিকে বসবে। ওদের তিনজনের গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে।

মাসখানেক আগে উপেনদার একটা চিঠি আসায় লালমণিরহাট যাওয়ার ব্যাপারটা বাবা বাতিল করেছে। সে চিঠিতেও কোনও ঠিকানা দেয়নি উপেন। কিন্তু লিখেছিল যে, চিন্তার কারণ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই বিস্তৃত সংবাদ জানাবে সে। ব্যবসার কথা ভাবছে। এর জন্য কিছু টাকার দরকার হবে। কত টাকা তা অবশ্য লেখেনি। শোভা জানে যে, টাকার অভাব হবে না। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে ফি-মাসে তিরিশ টাকা হিসেবে প্রায় দেড়শো টাকার মতো জমে আছে। চাইলে সেখান থেকে হুন্ডিতে টাকা চলে আসবে। বাবাও কিছু টাকা রেখে দিয়েছেন উপেনদার জন্য।

কিন্তু উপেনদা করছেটা কী? অনেক ভেবেও শোভা জিজ্ঞাসাটার কোনও সদুত্তর পায়নি। বাবাও যে পেয়েছে এমন নয়। সে উকিল মানুষ। উপেন লালমণিরহাটে একা একা ঠিকানা গোপন করে ব্যবসার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে— এটা বাবা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সেসব নিয়ে এখন ভাবা হচ্ছে না মোটেই। উপেনদার চিঠি আসায় বাড়ির চাপা আবহাওয়াটা আবার আগের মতো খোলামেলা হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের পথে মেয়েরা এখনও ঢাকা পালকি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বার হয়। ব্রাহ্ম মেয়েরা অবশ্য এসব মানে না। শোভার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, তাদের পরিবার ব্রাহ্ম হলে বেশ ভাল হত। করলা নদীর ধারে ব্রাহ্মসমাজের ঘরটায় বেশ যাওয়া যেত। সেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গল্প করে। কিন্তু বাবা ব্রাহ্মদের খুব একটা পছন্দ করে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিদ্বেষের কারণটাও বোধহয় সেই কারণেই। তবে উপেনদা চলে যাওয়ার পর বাবা শোভার হাতে একদিন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটা দেখেও কিছু বলেনি। কিন্তু খানিক আগেই বৈঠকখানায় নিতাই বলে ছেলেটা রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তুলতেই বাবা ধমক দিয়ে বলেছেন, 'ওসব

ন্যাকা ন্যাকা গান নিয়ে মাতামাতির কোনও অর্থই নেই বুঝলে? গাইতে গেলেই মনে হয় মেয়েছেলে হয়ে গিয়েছি।'

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার কারণে শোভার পায়ে ঝিঁঝি ধরেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করা শুরু করল। সামনেই একটা প্লেটে দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট পড়ে আছে। শোভা বিস্কুট খুব ভালবাসে। বিলিতি বিস্কুট। দেশিগুলো তেমন স্বাদের হয় না। পায়চারি করতে করতে একটা বিস্কুট ভেঙে সে মুখে দিল। তখনই শুনল অখিল নামের ছেলেটা বলছে, 'বুঝলেন দাদা! হিন্দু বেকারির রুটিতে কেমন একটা অ্যালকোহলের গন্ধ থাকে। মুসলিম বেকারির রুটি অনেক ভাল হয়।'

বাবা বললেন, 'তা-ই? মুসলিম বেকারির রুটি খেয়েছ তুমি?'

জবাবে অখিল কী বলল তা শোভা শুনতে পেল না। গরমটা বেশ গুমট হয়ে আসছে। ঝড় হতে পারে। গতকাল ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। শোভা একটা তালপাতার পাখা নিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগল। পাশের পাড়া দিয়ে বোধহয় কংগ্রেসের কোনও মিছিল যাচ্ছিল। সন্ধের পর বয়স্করা এলে যে জমিয়ে পলিটিক্সের আলোচনা হবে, সেটা শোভা জানে। শহর এখন গান্ধিজির ভূমিকা নিয়ে সরগরম। গোপাল ঘোষের বজরা পয়লা বৈশাখের বদলে রথের দিন জলে ভাসবে বলে ঠিক হয়েছে। নদীভরা জল না থাকলে বজরার মান থাকে না। সে জল বর্ষার আগে গোপাল ঘোষ পাচ্ছেন কোথায়? তিনি ঠিক করেছেন যে, বজরার নাম হবে 'ভারতমাতা'।

বৈঠকখানায় আবার জোর গলায় আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়বস্তু শহরে বায়োস্কোপ দেখানোর জন্য একটা ভাল হল দরকার। কেউ বেশ উত্তেজিতভাবে বলছিল যে, গত মাসে কলকাতায় গিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' বায়োস্কোপটা দেখে এসেছে। জলপাইগুড়িতে হল তৈরি হলে সেটা দিয়েই উদ্বোধন করা উচিত। আলোচনা শুনতে শুনতে শোভা আরামকেদারায় গা এলিয়ে বিস্কুট আর পাখার বাতাস খাচ্ছিল। তারপর কখন যে খানিকক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানে না। ঘুম ভাঙল ঘড়িতে ঢংঢং করে সাতটা বাজার শব্দে। শোভা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বুঝল বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ভিতরের বারান্দায় পাড়ার মেয়েরা এসে মায়ের সঙ্গে জোর গল্প জমিয়েছে এবং বৈঠকখানা থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। শোভা সেই ঘরে উঁকি মেরে বুঝল কেউ নেই। চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেটগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। এক কোণে একটা বেঞ্চির উপর পড়ে আছে কয়েকটা পত্রিকার প্যাকেট। গত দু-তিন দিনে সেসব এসেছে। এখনও খোলা হয়নি কেন, সেটা শোভা বুঝতে পারল না। সে কাজের লোককে না ডেকে নিজেই সরিয়ে ফেলল কাপ-প্লেটগুলো। এলোমেলো চেয়ারগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রেখে বাবার চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ারটায় আরাম করে বসে টেবিল ল্যাম্প বাড়িয়ে দিল। তারপর প্যাকেট থেকে বার করতে শুরু করল পত্রিকাগুলো। বাইরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া তাকে বেশ আরাম দিচ্ছিল বলে দরজাটা বন্ধ করল না শোভা। বাবা নিশ্চয়ই আশপাশেই কোথাও গিয়েছেন। শশীদাদু কিংবা নরেনজেঠুদের কেউ এখনই এসে পড়বে সান্ধ্য মজলিশের জন্য। তাঁদের কেউ এলে অবশ্য শোভা অনায়াসে খানিকক্ষণ গল্প করতে পারে। শশীদাদুর জন্য তামাক সে নিজেই দিতে পারে সেজে। তামাক সাজিয়ে দিতে শোভার বেশ লাগে, কিন্তু মা জানলে খুব রেগে যায়— এই যা।

প্রথম প্যাকেট থেকে বার হল একটা ইংরেজি পত্রিকা। নাম 'The Strand Magazine'। সবুজ রঙের মলাটে কালো কালিতে ছাপা বিলেতের কোনও একটা শহরের রাস্তার ছবি। বাবার খুব প্রিয় পত্রিকা এটা। শোভা খুব ভাল ইংরেজি জানে না, তবুও এই পত্রিকাটা কিছু কিছু পড়ে। বেশ রোমহর্ষক কাহিনি থাকে এতে। সে কোলের উপর পত্রিকাটা নিয়ে একটা একটা করে পাতা ওলটাতে লাগল।

মানুষের জীবনে কয়েকটি ক্ষণ আচমকা এসে মুহূর্তের মধ্যে স্থাপন করে যায় ভবিষ্যতের কোনও স্থায়ী পথ। কিন্তু যখন আসে, তখন ক্ষণটিকে শনাক্ত করতে পারে না কেউই। কারণ সে আসে আকস্মিকভাবে। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পাত্রপাত্রীদের কেউই আগাম জানতে পারে না সেই কালখণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। অসীম শক্তির অধিকারী কালপ্রবাহের সেই ধারা নিয়তির অমোঘ বিধান মেনে জড়িয়ে ধরে তাঁর প্রার্থিত চরিত্রদের।

পত্রিকায় মগ্ন শোভা লক্ষ করেনি, কেউ এসে থামল দরজার বাইরে। তারপর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দরজার ফাঁক দিয়ে আগন্তুকদের নজরে আসছিল এক অপূর্ব দৃশ্য! টেবিল ল্যাম্পের নরম শিখার আলোয় এক কিশোরী একটু ঝুঁকে কিছু একটা পড়ছে। এই গরমের দিনে তার অন্তর্বাসহীন শাড়ির ভাঁজে খানিকটা অন্ধকার। চুড়ি-পরা নগ্ন একটি হাত চুপ করে লেগে আছে চিবুকে। ঝুঁকে থাকার কারণে মুখটা অস্পষ্ট। আগন্তুক কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল সেই দৃশ্যের দিকে। তারপর যেন একটু লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে গেল দু'পা। তার পরনে দামি ধুতি আর পাঞ্জাবি। পায়ের কালো জুতো ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে। চুল এলোমেলো। বেশ খানিকটা পথ ভ্রমণ

দরজার ফাঁক দিয়ে আগন্তুকদের নজরে আসছিল এক অপূর্ব দৃশ্য! টেবিল ল্যাম্পের নরম শিখার আলোয় এক কিশোরী একটু ঝুঁকে কিছু একটা পড়ছে। এই গরমের দিনে তার অন্তর্বাসহীন শাড়ির ভাঁজে খানিকটা অন্ধকার। চুড়ি-পরা নগ্ন একটি হাত চুপ করে লেগে আছে চিবুকে। ঝুঁকে থাকার কারণে মুখটা অস্পষ্ট। আগন্তুক কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল সেই দৃশ্যের দিকে।

করে আসার কারণে চেহারায় ঈষৎ ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু সদ্য প্রত্যক্ষ করা অলৌকিক দৃশ্যের প্রভাবে আগন্তুকের মন বাইরের হাওয়ার মতোই যেন সতেজ হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে আলতো হাসি। এবার সে নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য একবার গলাখাঁকারি দিল।

শোভা চমকে উঠল। চকিতে আঁচলটা শরীরে ভালমতো জড়িয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝল, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এবং সে সান্ধ্য আড্ডার কেউ নয়। তবুও অন্দরমহলে ছুটে না গিয়ে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে বলল, 'কে?'

'আজ্ঞে আমি জামলদহ থেকে আসছি। উপেনবাবুর খবর নিয়ে এসেছি। আমার নাম গগনেন্দ্র মিত্র।'

শোভা পড়ি কি মরি করে ছুটল খবরটা মাকে জানাতে। দরজার ফাঁক দিয়ে গগনেন্দ্র পলকের জন্য দেখল একটি ছন্দোময় শরীরে আন্দোলন ভ্রমণ। রহস্যময় কাল ঠিক তখনই ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করলেন। সেই হাসি দেখে প্রসন্ন নিয়তি তাঁর খাতায় লিখতে শুরু করলেন দু'টি নরনারীর ভবিষ্যৎ।

ততক্ষণে গোটা বাড়িতে বেজায় সাড়া পড়ে গিয়েছে।

(ক্রমশ)

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

আগে মালবাজার ছিল পঞ্চায়েত এলাকা। তার পর হল পৌরসভা। এর পর মহকুমা শহর। ধাপে ধাপে মালবাজারের গ্রাম থেকে শহর হয়ে উঠবার পরও যেন কিছুতেই তার যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছিল না মালবাজার। কোথায় যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছিল! অনেকটা সেই রান্নার মতো— তেল, মশলা, নুন রান্নার যাবতীয় উপকরণ সব দেবার পরও রান্নার স্বাদ আসছিল না। আর ঠিক এইখানটাতেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য। তিনি ঠিক ধরেছিলেন খামতিটা কোথায়। বুঝেছিলেন মালবাজারের মর্যাদা বাড়াতে গেলে সর্বপ্রথম শহরটিকে সাজিয়ে তুলতে হবে। পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে। ডুয়ার্স জুড়ে রাস্তাঘাট ঢেলে সাজিয়ে, নতুন নতুন পর্যটক কেন্দ্র নির্মাণ করে, হোম স্টে ও ইকো টুরিজমকে উৎসাহ দিয়ে সমগ্র ডুয়ার্সব্যাপী পর্যটন বিকাশের যে স্বপ্নের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিকল্পনারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে চলেছে মালবাজার। তাই ডুয়ার্সকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে মালবাজার শহরকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। কারণ, মালবাজার হল পশ্চিম ডুয়ার্সের নিউক্লিয়াস। একদিকে যেমন খালং, বিন্দু, চাপড়ামারি, গরুমারা,

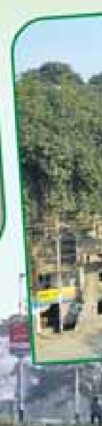

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

ধূপঝোড়া, গজলডোবা, পশ্চিম ডামডিম, মাগুরমারী, গরুবাথান ইত্যাদি সমস্ত পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলি তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে মালবাজারের ওপর নির্ভরশীল অন্য দিকে পর্যটকেরাও বর্তমানে মালবাজারকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখতে উৎসুক। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের পাশাপাশি একদিকে যেমন এগিয়ে এসেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী গৌতম দেব অন্যদিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী। আর এই সমস্ত পরিকল্পনাকে রূপদান করছেন শ্রী স্বপন সাহার নেতৃত্বাধীন মাল পৌরসভা। শহরের সমস্ত রাস্তা ও নালা ও সংস্কারের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নতি হচ্ছে সেই সঙ্গে শহরটাকে আলোর মালায় সাজিয়ে অত্যাধুনিক যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করে, লাইট এবং সাউন্ডের যুগলবন্দী ফাউন্টেন চালু করে, ভাষা শহিদ চক তৈরি করে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে মালবাজারকে। ভরা পর্যটন মরশুমের কথা ভেবে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে উদিচী কমিউনিটি হলকে। আমূল সংস্কার করা হয়েছে মালবাজার টুরিস্ট লজের সামনের রাস্তাটির। আর এই সমস্ত কাজের ফলে বাড়ছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যও। এ ভাবেই প্রতিদিন একটু একটু করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হতে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মালবাজার।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কোচবিহারের বাণীমন্দির ক্লাবের অতীত ঐতিহ্য ফিরছে

ঐতিহ্যের বাণীমন্দির এক সময় তার কৌলীণ্য হারালেও নতুন প্রজন্মের যুবকরা ফের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তখন রাজ আমল; সংঘ, সংগঠন ক্লাব তৈরি রীতিমতো একটা বিপ্লব। কোচবিহারের প্রাচীন ক্লাবগুলির মধ্যে বাণীমন্দির অন্যতম। সমাজসেবামূলক কাজ করার তাগিদ নিয়ে কোচবিহার শহরের উত্তরাংশের বেশ কিছু যুবক ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এই ক্লাবের। প্রতিষ্ঠাতারা এখন আর কেউ বেঁচে নেই। প্রয়াত অশ্বিনী সরকার, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই পাল, প্রদ্যুৎনারায়ণ বসু, ভবেশ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ধর, যুধান সরকার, নগেন সরকার প্রমুখরা ছিলেন এই ক্লাব গঠনের উদ্যোক্তা। সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় এই ধরনের ক্লাব বা সংঘ গড়ে ওঠেনি। তাই এই ক্লাবের পরিধি ছিল কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকা। মূলত পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া, গুঞ্জবাড়ি, সুভাষ পল্লি, কলাবাগান, বাদুরবাগান, টাকা গাছ, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি প্রভৃতি এলাকার যুবকরা ভিড় জমাত এই ক্লাবে।

১৯৪৬ সালে তৈরি হয় ক্লাব ঘর। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাদের চিন্তা ও চেতনার প্রভাব পড়ে ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচিতে। সেই সময় এই ক্লাবে নিয়মিত নাট্যচর্চা হত । নাট্যকার চারু রায় যুক্ত ছিলেন ওই নাট্যকর্মে। রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী নিতাইচন্দ্র পাল। নিতাইবাবুকে কোচবিহারের মহারাজারা কোচবিহারে নিয়ে আসেন কৃষ্ণনগর থেকে। পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৭ দিনের নাট্য ও সংস্কৃতি উৎসব হত। তাতে সক্রিয় অংশ নিত বাণীমন্দির ক্লাবের সদস্যরা। পুজো বলতে কোচবিহারের বৃহৎ অংশ জুড়ে হত পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব। ওই ক্লাবের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হত পুজো অঙ্গন।

বাণীমন্দির ক্লাব একই সঙ্গে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা করায় গোটা উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সত্তর দশক পর্যন্ত ফুটবলে বাণীমন্দির শুধু কোচবিহার জেলা নয়, রাজ্য ছাড়িয়ে আসামের বিভিন্ন বড় খেলায় অংশ নিত। ডুয়ার্স ও আসাম জুড়ে খেলে বেড়িয়ে বাণীমন্দির বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে। তখন একঝাঁক তরুণ ক্লাব আলো করে রাখত। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাণীমন্দিবের উজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও আশির দশকের শেষ দিক থেকে গোটা নব্বইয়ের দশক ছিল নিষ্প্রভ। তখন কোনওরকম কর্মকাণ্ড ছিল না এই ক্লাবের।

সম্প্রতি পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া ও গুঞ্জবাড়ি এলাকার কিছু যুবক আবার নতুন উদ্যমে ক্লাব পরিচালনার কাজে হাতে হাত মিলিয়েছে। গত অর্থ-বর্ষে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকার অনুদানও পেয়েছে ক্লাব। বাণীমন্দিরের সম্পাদক সুব্রত পাল জানান, 'আমরা আবার অতীতের স্বর্ণালী দিন ফিরিয়ে আনতে চাই। জেলা স্তরে লিগ খেলার ফুটবল টিম গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'গত পাঁচ বছর ধরে আসাম-বাংলা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় নিয়মিত। ক্লাবে নিয়মিত টেবিল টেনিস চর্চা হয়। সুব্রতবাবুর কথায় আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাণীমন্দির তার সুনাম হারিয়ে ফেলে। আসলে জেনারেশন গ্যাপের কারণেই ক্লাবে কিছুদিনের স্টপ গ্যাপ তৈরি হয়েছিল।

নাট্যকর্মীরা ক্লাবের ইতিহাসকে আবার ফিরিয়ে আনতে সঙ্কল্পবদ্ধ। অতীত দিনের প্রখ্যাত ফুটবলারদের মধ্যে যারা আজও জীবিত, বয়সভারে ক্লান্ত হলেও দিলীপ পাঠক, সুধীর দে, রঞ্জু ভট্টাচার্য, দেবব্রত মজুমদার, প্রদীপ রায় (ভোলা রায়)-রা এখন নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। অতীত দিনের কোচবিহার জেলার ওইসব প্রখ্যাত খেলোয়াড়রা প্রায় সকলেই বাণীমন্দিরের জার্সি পরেছিলেন বলে দাবি করলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। প্রয়াত বিনয়ভূষণ ধর বাণীমন্দিরের ক্রীড়াক্ষেত্রকে যেভাবে পরিচালনা করতেন তেমন একনিষ্ঠ মানুষেরও বড় অভাব বলে মন্তব্য প্রবীন খেলোয়ারদের।

বিগত দিনে বিশিষ্ট শিল্পী, খেলোয়াড়, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলোকিত করে রেখেছিল বাণীমন্দিরকে। সময়ের বিবর্তনে তা হারিয়ে যাবার নয়। তাই নেওয়া হয়েছে নতুন উদ্যোগ।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ছিটবাসীদের ঐক্যে ফাটল ধরানোই ছিল ভূমিদস্যুদের টার্গেট

ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল যখনই ভারতীয় নাগরিকত্ব বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করে জমি উদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে তখনই বাংলাদেশি ভূমিদস্যুদের মদতপুষ্ট সংগঠন ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি আক্রমণ শানিয়ে ছিটবাসীদের রক্ত ঝড়িয়েছে। সেই মর্মান্তিক কাহিনির ছিটকথা নিয়ে **সপ্তম পর্ব**।

২৭ অক্টোবর ২০১০। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই তাঁরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন। বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার অভ্যন্তরে ওঁদের বসবাস। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা ও মেখলিগঞ্জ সীমান্ত-ঘেঁষা এই এলাকায় রয়েছে একগুচ্ছ ভারতীয় ছিটমহল। রাজন্যশাসিত কোচবিহার রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষায় সাবেক বা অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পাটগ্রাম ট্র্যাক অর্থাৎ পাটগ্রাম ছিটগুচ্ছ। যেখানে বাঁশকাটা নামে ছিল ২১টি ছিটখণ্ড। এ ছাড়াও ৩২টি বিভিন্ন নামের ছিট ভূখণ্ড পাটগ্রাম থানার অভ্যন্তরে সরকারি নথি অনুযায়ী পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন কুচলিবাড়ি, উপেনচৌকি কুচলিবাড়ি, ভোটবাড়ি, বালাপুখুরি, বড়খেঙ্গির, রডনপুর, লোথামারি, বাগডোগরা, খরখরিয়া, কামাত চ্যাংড়াবান্ধা, পানিশালা, দ্বারিকামারি, ভোটহাট, ভোগরামগুড়ি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কিংবা অতিক্ষুদ্র গ্রাম বা ভূমিখণ্ড। এই সকল ভূখণ্ডে বসবাসরত কিংবা নিজ দখলে রেখে উত্তরাধিকারসূত্রে চাষবাসরত মানুষজন, যাঁরা কিনা ভারতীয় বলে নিজেদের ভাবতে শ্লাঘা বোধ করতেন, শত প্রতিকূলতার মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন ভারতীয় নাগরিকত্বের, তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটা হেস্তনেস্ত করার। সংগঠিতভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার লক্ষ্যেই মাথাভাঙা ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে তাদের দাবিপত্র প্রদান।

ডাক্তারপাড়া একটি সীমান্তগ্রাম। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বেশ কয়েক ঘর পরিবারের বাস। সকলেই মূলত স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। ডাক্তারপাড়ার মুখোমুখি সীমান্তরক্ষীবাহিনীর খাগড়িবাড়ি সীমান্ত চৌকি বা বি.ও.পি.। মাঝে সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া। ডাক্তারপাড়ার মুখোমুখি রয়েছে একটি সীমান্ত গেট। রয়েছে সীমান্তরক্ষীদের সজাগ নজরদারি। অক্টোবরের শেষ মানেই উত্তরবঙ্গে শীতের আনাগোনা। ভোরবেলায় একটা হিমেল-হিমেল ভাব। কখনও-সখনও কুয়াশারও আবির্ভাব ঘটে থাকে। এরই মধ্যে ভোররাত থেকে সীমান্তে আসার প্রস্তুতি শুরু করে ছিটবাসীরা। লক্ষ্য ডাক্তারপাড়া। সেখানে জমায়েত হয়ে অতঃপর গেট অভিমুখে যাত্রা। নরম শীতের আমেজে ভোর হতে না হতেই ডাক্তারপাড়ায় আসতে শুরু করেছেন বিভিন্ন ছিটের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা। সকাল ৭টার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন কয়েকশত ছিটমহলবাসী। এদিকে, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও ছুটতে শুরু করেছেন খাগড়িবাড়ি সীমান্তের দিকে। অনেকেই সাতসকালে বেরিয়ে পড়েছেন কোচবিহার শহর থেকে মাথাভাঙার উদ্দেশে। সেখান থেকেই ১১-এ রাজ্য সড়ক ধরে শিকারপুর পার হয়ে যেতে হবে চেনাকাটা মোড়। সেখান থেকে সেই রাজ আমলে নির্মিত ইমিগ্রেশন রোড (পশ্চিম) ধরে বেশ কিছুটা এগলেই বালারহাট বি.এস.এফ. ক্যাম্প। ক্যাম্প ছাড়ালেই ডান হাতে রয়েছে একটি বাংলাদেশি ছিটমহল ভাণ্ডারদহ। বাংলাদেশি ছিটমহলকে ডান হাতে রেখে কিছুটা এগলেই সীমান্ত সড়ক এবং সেই সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া।

কাঁটাতারের বেড়া হঠাৎ করে যেন আটকে দিয়েছে পশ্চিম ইমিগ্রেশন রোডকে। হাত দিয়ে আগলে বলছে, আর নয়। এখানেই থেমে যাও। অথচ এই রাস্তাটি ছিল একদা দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের পুব থেকে পশ্চিম সীমা পর্যন্ত যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। রাজধানী কোচবিহার থেকে পশ্চিমমুখী এই সড়কটি ধরে মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ এবং হলদিবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হত। সড়কটি মূলত কাঁচা হলেও রাস্তা বরাবর সমান্তরাল সিমেন্টের বা কংক্রিটের দু'টি সারি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়কালে ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি ছিল মূল যানবাহন। ওইসব গাড়ির সরু চাকা যাতে রাস্তায় বসে না যায় কিংবা বর্ষাকালেও যাতে অনায়াসে যান চলাচল করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে এই রাস্তার গুরুত্বের আরেকটি দিক হল, সেই সময়কালে রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের হলদিবাড়ি ছিল রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। ১৮৭৬ সালে তৎকালীন নর্দার্ন রেল কোম্পানি শিয়ালদা ও জলপাইগুড়ির মধ্যে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার স্বার্থে হলদিবাড়ি স্টেশন তৈরি করেন। ১৮৭৭ সালে এই পথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। হলদিবাড়ি স্টেশন ছিল তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের একমাত্র রেল স্টেশন।

বিভিন্ন ছিটের নারী পুরুষ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা। সকাল ৭টার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন কয়েকশত ছিটমহলবাসী। এদিকে, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও ছুটতে শুরু করেছেন খাগড়িবাড়ি সীমান্তের দিকে। অনেকেই সাতসকালে বেরিয়ে পড়েছেন কোচবিহার শহর থেকে মাথাভাঙার উদ্দেশে।

প্রথম রেল স্টেশনও বটে। শুরুতে মিটার গেজ লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হলেও ১৯২৬ সাল থেকে গেজ পরিবর্তন হয়ে ব্রড গেজ লাইনে ট্রেন চলতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৮ সালে তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ উপলক্ষে পাত্রীপক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কন্যা সুনীতিদেবীকে নিয়ে কলকাতা থেকে রেলপথে হলদিবাড়িতে এসে নামেন এবং সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ইমিগ্রেশন রোড (পশ্চিম) দিয়ে কোচবিহারে নামেন। তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ১৮৭৮ সালে ৪৩ মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটি নির্মাণ করেছিলেন, যার মধ্যে পাটগ্রামের কাছে ধবলা নদীর উপর সেতু অন্যতম। একদা এই রাস্তাটি অধিকাংশ কোচবিহারি ছিটমহলের মানুষজন ব্যবহার করতেন রাজধানী শহর বা রাজনগর কোচবিহারে আসবার জন্য।

ইমিগ্রেশন রোড (পশ্চিম) সেখানে আজ অবরুদ্ধ, সেখান থেকে বাম দিকে সীমান্ত সড়ক ধরে কিছুটা এগলেই খাগড়িবাড়ি সীমান্ত চৌকি। কোচবিহার থেকে আসা সাংবাদিককুল সেই পথ ধরেই সাতসকালে হাজির অকুস্থলে। একদিকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ডাক্তারপাড়ায় ছিটমহলগুলির কয়েকশত আবালবৃদ্ধবনিতা আর কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে সীমান্ত সড়কের উপর তাবৎ সাংবাদিককুল, স্বভাবতই সীমান্ত প্রহরায় বি.এস.এফ. জওয়ানরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকাল সাড়ে আটটার পরপরই ছিটবাসীরা 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'-এর ফেস্টুন সামনে রেখে হাতে ভারতের পতাকা নিয়ে মিছিল করে এগতে থাকে সীমান্ত গেটের দিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রহরারত বি.এস.এফ. জওয়ানরা গেট আটকে দিয়ে সীমান্ত বরাবর দাঁড়িয়ে পড়েন। মূল ভূখণ্ডে প্রবেশে বাধা পেয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন ভারতীয় ছিটবাসীরা। সাংবাদিকরাও সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে থাকেন। একসময় বি.এস.এফ. জওয়ানরাও সাংবাদিকদের সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। চিত্র সাংবাদিকরা খেতের মধ্যে নেমে ধান গাছের আড়াল থেকে ফোটো তুলতে থাকেন। অনেকটা যেন বি.এস.এফ.-এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

কখনও বন্দে মাতরম্, কখনও ভারতমাতা কি জয়, কখনও ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল জিন্দাবাদ কিংবা করিডর বা ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবিতে উচ্চগ্রামে স্লোগান দিতে দিতে এলাকা সরগরম করে তোলে ছিটমহলবাসীরা। বি.এস.এফ.-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ছুটে আসেন খাগড়িবাড়ি সীমান্তে। খবর পৌঁছে যায় কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে। শুরু হয় প্রশাসনিক তৎপরতা। বেলা যত বাড়তে থাকে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ছিটবাসীদের জমায়েত। অক্লান্ত ছিটবাসীদের স্লোগান সীমান্তের এপারে বসবাসরত গ্রামবাসীরাও বিপুল আগ্রহ নিয়ে অবলোকন করতে থাকেন। একসময় ছিটবাসীরা ডাক্তারপাড়া সীমান্ত গেটের ওপারে বসে পড়ে অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন। বেলা গড়াতে থাকে। ডাক্তারপাড়ায় পুরোদস্তুর শুরু হয় রান্নার আয়োজন। দুপুরবেলায় দু'মুঠো ভাত আন্দোলনকারীদের পেটে জোগান দেওয়াই লক্ষ্য। সাতসকালে চিঁড়ে-মুড়ি পুঁটুলিতে বেঁধে মাইলের পর মাইল হেঁটে তাঁরা এসেছেন সীমান্তে। চিঁড়ে-মুড়ি-গুড় দিয়ে প্রাতরাশ সেরেছেন। আন্দোলন সেরে বাড়ি ফিরতে অনেকেরই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যাবে। ফলে মধ্যাহ্ন আহার না হলে কি চলে?

দুপুরবেলা কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফে মাথাভাঙা ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। বি.এস.এফ.-এর পদস্থ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে অবস্থান করছিলেন। এর পর তাঁরা ছিটমহলবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বক্তব্য জানতে চান। ছিটবাসীরা লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রশাসনিক কর্তাদের জানান। ছিটবাসীদের পক্ষে 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল' কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিতে যে সকল দাবি উত্থাপিত হয় তা হল, ভারতীয় ছিটবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান, পরিচয়পত্রের সাহায্যে মূল ভূখণ্ডে অবাধে যাতায়াত, তিন বিঘার মতো করিডর নির্মাণ, ছিটগুলিতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম, নাগরিক পরিষেবা প্রদান, বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ ও জমি উদ্ধার ইত্যাদি। স্মারকলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বি.ডি.ও. বা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর ছিটবাসীরা ডাক্তারপাড়ায় মধ্যাহ্ন আহার সম্পন্ন করে বিকেলবেলায় যে যার ছিটমহলের উদ্দেশে রওনা দেন। নিরাপদেই তাঁদের কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। পরের দিন সংবাদপত্রে (পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংস্করণে) গুরুত্ব সহকারে এই সংবাদ প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে বাংলাদেশের ভূমিদস্যুদের মদতপুষ্ট সংগঠন ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি। শুরু হয় ষড়যন্ত্র, ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলকে দুর্বল করার নানাবিধ চক্রান্ত। তাদের টার্গেট হয়ে ওঠে বলরাম বর্মন। কারণ, যে কোনও মূল্যে তাঁকে শায়েস্তা করতে হবে। ভাঙতে হবে ভারতীয় ছিটবাসীদের ঐক্যকে।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

আলিপুরদুয়ার উৎসব দেখে বেরিয়েছি। হেলিকপ্টারে ওঠার আগে একটা বিড়ি ধরাতেই শুনলাম কে জানি বলছে, 'রাভাও খায়া জাত'। বুঝলাম ঠান্ডায় পাইলটের কথায় বর্ণ-বিপর্যয় হচ্ছে। এবার কোথায় যাব তা বলতে গিয়ে হিন্দির মতো কিছু বলছে। বইমেলা থেকে কোথায় গেলাম?

২

ডুয়ার্সের গন্ডাররা চোরাশিকারি থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্য সাংকেতিক ভাষায় তাঁদের 'গন্ডার সম্মেলন'-এর দ্বিকোটি বর্ষ উদ্‌যাপনের স্থানটির নাম জানিয়ে বার্তায় লিখেছে, 'বহু বহু কাল ধরে চিনি এমন সঙ্গীদেরই আসতে বলবে'। একটা ভাল গন্ডার আমাকে বলেছে, 'বার্তা থেকে কয়েকটা শব্দ বাদ দিলে তুমিও জানবে কোথায় হচ্ছে সম্মেলন আমাদের।' বলুন দিকি কোথায়?

৩

ভূতের জুতোর ধরন কেমন ভেবে।
কাটা লাগান সুধী পাঠক এবে।
তিব্বতের পুঁথি থেকে পাওয়া এই শ্লোকে
আছে একটা জায়গার নাম। পটলরাম পর্যটক
ক্লু দিয়ে বলেছে, 'আছে জলঢাকার কাছে'।

গত মাসের উত্তর ঃ ১) বক্সা। ২) মূর্তি। ৩) কোলাখাম। ৪) লাভা

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

ডুয়ার্সের মেগাসিরিয়াল

অরণ্য মিত্র

থ্রিলারের ছোঁয়া লাগা মেগা সিরিয়াল হলেও এ এক অন্য ডুয়ার্সের চলমান ছবি। এই ধারাবাহিকে ডুয়ার্স রোমান্টিক নয় মোটেও বরং অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যেখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের তরুণী স্বেচ্ছায় বেছে নেয় শরীর বিক্রির পেশা, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভিন রাজ্যে যৌনদাসী হয়ে চলে যায় অসংখ্য বালিকা, কিশোরী, তরুণী। ডুয়ার্সের আকর্ষণীয় টুরিস্ট স্পটের সুসজ্জিত রিসর্টে নিঃশব্দে ডিল হয় হোমমেড পর্ণ ভিডিয়োর। অপরাধ জগতের এইসব ছোট-বড়-মাঝারি মাপের চক্রগুলিকে দিল্লিতে বসে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অপরাধ জগতের এক রহস্যময় চাঁই। ভায়া কলকাতা হয়ে নির্দেশ আসে এক ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছ থেকে। ইতিমধ্যে কাশিয়াগুড়ি গ্রামের নিখোঁজ যুবককে খুঁজতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর হাতে এসে পড়ে ক্ষীণ এক সূত্র। সেই সূত্র ধরেই ধাপে ধাপে ফুটে ওঠে অন্ধকারময় ডুয়ার্সের ছবি।

১

রাম মিশ্র মুখ-চোখ ধুয়ে ছ'তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। আবহাওয়া চমৎকার। গাছপালার ফাঁক দিয়ে শুকনা মোড় দেখা যাচ্ছে। এখনও শিলিগুড়ি জেগে ওঠেনি। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। রাম মিশ্রর মন আবহাওয়ার মতোই ফুরফুরে এখন। এই চমৎকার সাজানো অথচ ছোট ফ্ল্যাটটা নিয়ে শিলিগুড়িতে তাঁর তিনটে ফ্ল্যাট। বড় আর জমকালো ফ্ল্যাটটাতে পূর্ণিয়া থেকে পরিবার বা আত্মীয়স্বজন এলে ওঠে। বাকি দুটোর একটাতে তিনি থাকেন কাজের সময়। কাজ হালকা হলে চলে আসেন সেই ফ্ল্যাটটায়। রাম মিশ্র কাজের মানুষ। কনট্রাক্টর মানুষ। লাইসেন্সের মাত্রাও উপরের দিকে। মেঘালয়, নেপাল, আসাম ধরে ডুয়ার্সের অনেক জায়গাতেই তাঁর কনস্ট্রাকশন উঠছে। তিনি পান-তামাক খান না। কখনও কখনও জর্দাবিহীন সুগন্ধি মশলা চেবান মাত্র। কাজ হালকা হলে একমাত্র নেশাটির জন্য এই ফ্ল্যাটে চলে আসেন। গতকাল বিকেলেই এসেছেন। আগামী তিন-চার দিন বেশ হালকা। ঝাংগিবাড়িতে পুরানো বাজারের পাশে নয়া বাজার বানাচ্ছে সরকার। কাজ কালকেই পাকাপাকি হাতে এসেছে। ভাল দাঁও। বাজার বানাবার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। যেখানে ভবিষ্যতে টাকা উড়বে, সেই জায়গাটা বানাতে গিয়ে টাকার অভাব থাকে না। রাম মিশ্র কাজটা টার্গেট করেছিলেন। এমনিতে সমস্যা নেই। ডিল ফাইনাল হলেই হল। তাই রাম মিশ্র একেবারে বিধায়ক স্তর থেকে শুরু করেছিলেন। ঝাংগিবাড়ির প্রধান একটু আদর্শবাদী হওয়ায় ব্যাপারটা থমকে যায়। বিধায়ক তখন মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'ন'টার মধ্যে ছ'টাই আমাদের। প্রধান হওয়ার মতো আরও পাঁচজন আছে।'

গত সপ্তাহে বদলানো হয়েছে প্রধান। তারপর কাল ডিল ফাইনাল হতেই এই ফ্ল্যাটে চলে এসেছেন রাম মিশ্র।

মধ্য চল্লিশের রাম মিশ্র শিলিগুড়িতে মোটামুটি পরিচিত। ক্ষমতায় থাকা লোকজনের সঙ্গে তাঁর ভাল খাতির। এই কারণে তিনি একমাত্র নেশার ব্যাপারে বেশ সতর্ক। নেশার দিন আজ থেকে শুরু হবে। ন'টা নাগাদ তিনি এই কমপ্লেক্সের গাড়ি রাখার জায়গা থেকে সাদা ইনোভাটা নিয়ে নিজে চালিয়ে বার হবেন। সেবকে দাঁড়াবেন গিয়ে। সেখানে মেয়েটা উঠবে গাড়িতে। তারপর দু-তিন দিন ভরপুর নেশা।

মেয়ের ব্যাপারে রাম মিশ্র একটু খুঁতখুঁতে। পেটের দায়ে না এসে যে মেয়েগুলো শখ মেটাতে ফুর্তি করার জন্য নোট কামাতে আসে, তারাই রাম মিশ্রর প্রথম পছন্দ। কিন্তু এমন জিনিস সবসময় পাওয়া যায় না। আগে তো প্রায় পাওয়াই যেত না। বছর দশেক হল বেড়েছে। মাঝে মাঝে এমন দু'-চারটে এসেছে যে তাক লেগে গিয়েছিল রাম মিশ্রর। এইসব কচি-তাজা মেয়ের জন্য পয়সাটা কোনও ঘটনাই হয় না।

আজকের মেয়েটা নাকি তেমনই একজন। সবে কুড়ি পেরিয়েছে। বয়সের সার্টিফিকেট দরকারে দেখিয়ে দেবে। জয়গাঁওয়ের রাজা চৌধুরীর কাছ থেকে পাওয়া সূত্রে মেয়েটাকে পেয়েছেন তিনি। আজ বার হবে, পরশু সন্ধেয় ফিরবে। সেবক থেকে তুলে নিয়ে নামিয়ে দিতে হবে জলপাইগুড়িতে। রাম মিশ্রর অন্যতম পছন্দের রিসর্ট 'গ্রিন টি'তে সাজানো-গোছানো এসি রুম সমেত দু'কামরার একটা দোতলা অপেক্ষা করে থাকবে। ভরপুর নেশা।

রাম মিশ্র স্নান সেরে পুজো করে প্রাতরাশ শেষ করে ব্যালকনিতে এসেছিলেন। সাড়ে আটটা নাগাদ ফ্ল্যাট ছেড়ে নিচে নামবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। মাঝখানের এক ঘণ্টা কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। খানিকক্ষণ পূর্ণিয়ায় বউয়ের সঙ্গে কথা বলে কাটালেন। দার্জিলিঙের এক হাফ মোর্চা নেতাকে ফোন করে পরিস্থিতি জেনে নিলেন কয়েক মিনিট ধরে। এর পর তিনি রিসর্টের ম্যানেজারকে ফোন করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তখন একটা ফোন এল। নাম্বারটা সেভ করা ছিল না। কিন্তু শেষের জোড়া 'ফোর নাইন' দেখে বুঝলেন

মন্টু জার্নালিস্টের কল। বেশ কিছুদিন যোগাযোগ না থাকায় রাম মিশ্র আগ্রহী হয়ে কলটা রিসিভ করে বললেন, 'হাঁ মন্টুবাবু! বোলেন।'

'ঝাংগিবাড়ি বাজারের ওই জমিটায় বিশ বছর আগে একটা স্টে পড়েছিল না জলপাইগুড়ি কোর্টের?

খবরটা রাম মিশ্রর জানা। তিনি আমোদ পেয়ে বললেন, 'কাল ডিল ফাইনাল হল আর আজ আপনি সন্দেশ পেয়ে গেলেন! কে বলল বলেন তো?'

'সাংবাদিকরা সোর্স বলে না মিশ্রজি!'

'আপনার চেনেলে খবর লিক হলে আমার কী? ওই চেনেল তো এদিকে চলেই না।'

'আমার চ্যানেলে কেন চলবে? বেচে দেব।'

'তবে তো মুসকিল হোবে।' রাম মিশ্র চিন্তিত হওয়ার সুরে বললেন। তারপর হা হা করে হেসে বলতে লাগলেন, 'আমি জানি সন্দেশ কে ভেজেছে। আপনারা জার্নালিস্টরা বহত চুতিয়া আছেন। নেক্সট উইকে ফোন করবেন। ডিল হবে। বেশি বোলবেন না।'

ফোন রাখলেন রাম মিশ্র। তিনি ভালই জানেন, এই বাজার এখন যে জমিতে তৈরি হবে, সেটা এক মাস্টারের জমি ছিল। সে ব্যাটাই স্টে এনেছিল কী একটা কারণে। এখন মাস্টার মরে ভূত। তাঁর ফ্যামিলির কেউ আছে কি না কে জানে। এর বাইরে ঝাংগিবাড়ি এলাকায় যে দু'-চারজন এ খবর জানে, তারা এই ডিলেই আছে। খবর তাদেরই কেউ দিয়েছে মন্টু জার্নালিস্টকে। ওই লোকটার নেটওয়ার্ক সাংঘাতিক। চ্যানেল থেকে তো দশ হাজারও পায় না মাস গেলে। হাবভাব দেখলে অবশ্য সেটা বোঝার উপায় নেই।

রাম মিশ্র ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকলেন একটা পানমশলার প্যাকেটের খোঁজে।

২

পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর কনক দত্ত ধূপগুড়িতে থাকেন। আসলে তিনি এই তল্লাটেরই ছেলে। প্রায় চল্লিশ বছর পুলিশের কাজে গোটা পশ্চিমবঙ্গ চষে বেড়িয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে কলকাতায় হয়েছে। মেয়ে-জামাই-নাতি চেয়েছিল যে, কনক দত্ত কলকাতাতেই ফ্ল্যাট কিনে থিতু হবেন। কিন্তু তিনি সেটা শোনেননি। বছর বিশেক আগে এখানে কয়েক মাস থানার দায়িত্বে থাকার সময় ঠিক করেছিলেন অবসরের পর পাকাপাকি থেকে যাওয়ার কথা। তাঁর স্ত্রীও খুশি হয়েছে এখানে এসে। একটু বড় জমিতে একটা ছোট বাড়ি।

কাশিয়াগুড়ি থেকে রান্নার কাজ করার জন্য উমা দাস বলে একজন বছর চল্লিশের মহিলা আসেন। ধূপগুড়ি থেকে লোকাল বাসে চল্লিশ মিনিটের মতো লাগে আসতে। মহিলাটি সাড়ে আটটা-ন'টা নাগাদ এসে বিকেল চারটের দিকে চলে যান। বাংলাদেশের মেয়ে। ভারতে বিয়ে দেওয়ার জন্য বাপ তাঁকে কিশোরী বয়সে সীমান্ত পার করে কাশিয়াবাড়িতে চ্যাংড়াবান্ধায় আত্মীয়র কাছে রেখে গিয়েছিলেন। স্বামীভাগ্য ভাল ছিল না। একটাই ছেলে। কলেজে ভরতি হয়েছে। পড়াশোনায় ভালই। অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে সংসার টানছেন তিনি। মনে বড় আশা যে, ছেলেটা মাস্টার হবে।

মহিলার রান্নার হাত অবশ্য বেশ ভাল। কনক দত্ত ভোজনরসিক মানুষ। শুগার ধরেনি বলে ভালমন্দ খেতে পারেন এখনও। তাঁর আশা, আজ হালকা সরষে দিয়ে আড় মাছের ঝাল খাবেন। কাল সন্ধেয় ধূপগুড়ি হাট থেকে কেনা মাছ কেটে ফ্রিজে রাখাও আছে।

কনক দত্ত ঘড়ি দেখলেন। ন'টা পঁচিশ। উমা এখনও আসেনি। না এলে সে ফোন করে জানিয়ে দেয়। ফোনটা তাঁর ছেলের। কিন্তু আজ এখনও কোনও ফোন আসেনি। কনক দত্ত বুঝতে পারছিলেন না যে, আড় মাছের ঝাল রান্না হবে কি না। এইভাবে পৌনে দশটা পর্যন্ত একটু টেনশনে কাটানোর পর কনক দত্ত দেখলেন উমা আসছে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কনক দত্তের পুলিশি চোখ কিছু একটা অনুভব করল। তিনি বললেন, 'কিছু হয়েছে নাকি উমা? দেরি করলে যে?'

উমা থমকে দাঁড়াল। তাঁর মুখ-চোখ প্রতিদিনের মতো সহজ নয়।

'জ্বর-টর হয়েছে নাকি?'

'ছেলেটা কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি স্যার।'

কনক দত্তর ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছে?'

'কাল সকালে আমার সঙ্গেই বার হইছিল সার। ময়নাগুড়িতে একজনের সঙ্গে দেখা করবে। কী একটা কাজের ব্যাপার ছিল। কিছু টাকা আসত। শিলিগুড়িতেও যাইতে পারে কইসিল।'

'ফোন করেছিলে?'

'পাশের বাড়ি থেকে অনেকবার করসি সার। ফোন অফ ছিল। সকালেও করসি। অফ। আপনে একবার করবেন সার।'

উমার ছেলের নাম্বার কনক দত্তর মোবাইলে ছিল। তিনি রিং করলেন। শোনা গেল 'সুইচড অফ'।

'কার সঙ্গে গিয়েছে, সেটা জানো?'

'তপন বলে একটা ছেলে। ময়নাগুড়ি থাকে। দেবীনগরে।'

কনক দত্ত ভাবলেন একটু। হয়ত শিলিগুড়িতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করেছে। রাতে আর ফেরেনি। ফোন ধরবে না বলে বন্ধ করে রেখেছে। এ বয়সের ছেলেদের কাছে এসব খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার নয়।

'আর খানিকক্ষণ দেখো। মনে হয় দুপুর বিকেলের মধ্যেই চলে আসবে। ছেলে তো বড় হচ্ছে এখন।'

'ও এইরকম করার ছেলে না সার। বাইরে রাতে থাকতেই চায় না।'

'আগেই অত ভাবছ কেন? তুমি বরং ফিরে যাও। আজ রান্না করতে হবে না।'

উমা অবশ্য গেল না। আড় মাছের সরষে ঝাল বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কনক দত্ত এর পর দু'ঘণ্টায় তিনবার ফোন করল শ্যামলের নাম্বারে। উমার ছেলের নাম শ্যামল। তিনবারই এক উত্তর পেলেন। কনক দত্তর ভুরু কুঁচকে থাকা ভাবটা মিলিয়ে গেল না তাই। অবসরের পর এসব মাথা থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। টিভিতে খেলা আর সিনেমা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখেন না। তবুও এত বছরের অভ্যেস। অজান্তেই মন পুলিশের সন্দেহ নিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতে থাকে। শ্যামলকে তিনি একবার দেখেছেন কয়েক মাস আগে। কোথাও গিয়েছিল। ধূপগুড়িতে নেমে মায়ের সঙ্গে ফিরবে বলে এ বাড়িতে আসে। কনক দত্ত কয়েকটা কথাও বলেছিলেন শ্যামলের সঙ্গে। নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছেলের পক্ষে একরাত কোনও খবর না দিয়ে বাইরে কাটানো একটু কষ্টকল্পিত ব্যাপার। তবে এই বয়সে হঠাৎ করে এসব করে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়। হয়ত ছেলেটা বাড়িতে ফিরতে না পেরে অপরাধবোধে ভুগছে আর সেই কারণে বাড়িতে ফোন করেনি।

কিন্তু এখন বাজে বেলা এগারোটা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না এলে গোটা ব্যাপারটা অন্যভাবে ভাবা হবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে আরেকবার ফোন করলেন কনক

তবুও এত বছরের অভ্যেস। অজান্তেই মন পুলিশের সন্দেহ নিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতে থাকে। এ ছেলের পক্ষে একরাত কোনও খবর না দিয়ে বাইরে কাটানো একটু কষ্টকল্পিত ব্যাপার। তবে এই বয়সে হঠাৎ করে এসব করে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়।

মনামি নগ্ন শরীরটা এলিয়ে ছিল সোফার উপরে। সামনে খাটের কোনায় বসে সেটা দেখতে দেখতে নবীন বলেছিল, 'আউটস্ট্যান্ডিং ফিগার! ডু ইউ এভার থিঙ্ক অ্যাবাউট মুভি?' 'নায়িকা?' একটু তাচ্ছিল্যের সুরে প্রশ্ন করেছিল মনামি, 'আই ক্যান অ্যাক্ট বেটার দ্যান বলিউডস অ্যাকট্রেস।' 'নো নো! বলিউড কেন? সিম্পল ভিডিয়ো।' নবীনের বাংলায় নেপালি টান সামান্য।

দত্ত। উমার মুখ-চোখ থমথমে হয়ে আছে। তাঁর ভেতরের টেনশনটা অনুমান করে কনক দত্ত ভাবলেন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। কথা বললে মনের চাপ অনেক কমে যায়। তিনি বেসিনে হাত ধুয়ে খাওয়ার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামলের কাজটা কী ধরনের, সেটা কিছু জানো?'

'বলছিল সার দেবীনগরে তপনের মামা একটা ইশকুল চালু করবে। পড়ানোর কাজ।'

'তবে যে শিলিগুড়ি যাবে বলেছিলে?'

'তপনের মামা সার শিলিগুড়ি থাকেন।'

'তোমাকে শেষ কখন ফোন করেছে?'

'ময়নাগুড়ি যায়ে ফোন করসিল সার দিদির নাম্বারে।'

দিদি মানে কনক দত্তর বউ। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথোপকথন শুনছিলেন। পুলিশের বউ। তাই তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন, 'একটা সাতান্নতে ফোন এসেছিল। আমি কল টাইম দেখেছি।'

'তার মানে প্রায় দুটো। তা-ই যদি হয় তো শিলিগুড়িতে ওই মামার কাছে যেতে যেতে নিশ্চয় সাড়ে চারটে হয়েছে, তারপর কথাবার্তা হতে হতে নিশ্চয় ছ'টা-টটা বেজে গিয়েছিল। মনে হয় সেই কারণেই আর ফেরেনি।'

'সেটা তো ফোন করে বলে দিতে পারত?'

প্রশ্নটা বউয়ের। কনক দত্তর মতো অভিজ্ঞ পুলিশের কাছে এই সরল প্রশ্নটার উত্তর অজানা থাকায় তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন।

৩

শরীর নিয়ে মনামির কোনও সংস্কার নেই। নাইনে পড়তে সে প্রথম শরীর বিনিময়ের উত্তেজনাটা পেয়েছিল কেবল টিভির বিল নিতে আসা ছেলেটার থেকে। তিন-চারবার শরীরের খেলা খেলে নিয়ে মনামি সাবধান হয়। ছেলেটাকে বলেছিল আর না আসতে। কিন্তু রক্তের গন্ধ পাওয়া বাঘ তাতে রাজি হয়নি। ফলে মনামি বাবাকে বলেছিল, ছেলেটার আচরণ ভাল নয়। বাবার এক ফোনে কাজটাই চলে যায় সেই বোকা ছেলের। এর পর কয়েক মাস মনামি কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যায়নি। পরের বছর পুজোয় আলাপ হয় কমপ্লেক্সের অন্য টাওয়ারে থাকা একটি গুজরাতি ছেলের সঙ্গে। প্রায় সমবয়সি। মনামির শরীরের সে ছিল দ্বিতীয় সঙ্গী। সে অবশ্য দু'দিনের পর আর এগয়নি। মনামির নিষেধ শুনে সরে যায়। কিছুদিন ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল। মনামি তারপর নাম্বার বদলে ফেলে। মাধ্যমিকের পর তার বয়ফ্রেন্ড হয়। কলেজে ওঠা পর্যন্ত এমন তিনটে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে নিজের ফ্ল্যাটেই প্রচুর উদ্দাম সময় কাটিয়েছে।

শিলিগুড়িতে মনামি তার মা-বাবার সঙ্গে এই বিরাট ফ্ল্যাটটায় থাকলেও দিনের অনেকটা সময় সে একাই কাটায়। বাবা সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। মাঝে মাঝেই রাতে ফেরেন না। ফিরলেও রাত ন'টা। মা ডাক্তার। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত অনেকদিন একাই কাটিয়ে দেয় তাই মনামি। এখন সে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পড়াশোনায় তার খুব একটা আগ্রহ নেই। সে জানে যে, আর তিন-চার বছর পর কোনও এক প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হবে। তার নিজেরও এতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে এই স্বাধীনতা কড়ায়-গন্ডায় উপভোগের জন্য সে একটা সার জিনিস বুঝে নিয়েছে। শরীর তার কাছে কোনও সংস্কার নয়। তার ফিগার বেশ ভাল। রং চমৎকার। মুখটাও সুন্দর। বয়ফ্রেন্ড পটাতে তার দশ মিনিটও লাগে না।

কিন্তু নিজের বয়সি বয়ফ্রেন্ড থেকে মনামির খুব একটা লাভ হচ্ছিল না। উচ্চমাধ্যমিকের পর তার নজর পড়ল রাজেশ আগরওয়ালের দিকে। মোবাইল আর কম্পিউটিং ডিভাইসের পেল্লায় দোকান। বয়স পঁয়ত্রিশের আশপাশে। বিরাট ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। আলাপের সাত দিনের মাথায় রাজেশ এই ফ্ল্যাটে আসে। ফ্ল্যাটে নিজের ঘরের বাইরেও রাজেশের সঙ্গে টুকটাক বেরিয়ে আশপাশের হোটেলে বা রিসর্টের ঘরের বিছানাতেও সময় কাটিয়েছে মনামি। একটু হামলে পড়া খাই-খাই ভাবের ছেলে রাজেশ। তবে টাকার ব্যাপারে একটু কিপটে ছিল। তবুও বয়ফ্রেন্ডদের থেকে সেই প্রথম নগদ হাতে পাওয়া শুরু হয়েছিল তার। টাকার যে দরকার ছিল তা নয়। হাতখরচ সে ভালই পেত। চাইলেই পেত। তবুও একবার পনেরো-কুড়ি হাজার হাতে আসার একটা আলাদা মজা আছে। আর টাকা হল টাকাই!

কলেজে ভরতি হওয়ার পরপর রাজেশকে কাটিয়ে দিয়েছে মনামি। সে জানত যে, রাজেশ সরতে চাইবে না। তাই শেষ ফোনে ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'আমার ফ্ল্যাটে তোমার একা আসার ছবি সিসি কমপ্লেক্সের সিসি ক্যামেরায় ধরা আছে, সেটা জানো? ফাঁসতে চাও?'

রাজেশ আর রিস্ক নেয়নি। এর কিছুদিন পর নবীন রাইকে পায় মনামি। নেপালের ছেলে। ব্যবসাসূত্রে শিলিগুড়িতে প্রায়ই আসে। লম্বা, সিনেমার নায়কের মতো চেহারা। বয়স চল্লিশের বেশি। নবীন রাই তার বয়ফ্রেন্ড হয়েছে মাসকয়েক হল। মনামি এখন তাকে বদলানোর কথা ভাবতে পারছে না। নবীন রাই তাকে অন্য একটা প্রস্তাব দিয়েছিল কোনও একটা হোটেলের প্রথম শ্রেণির ঘরে উদ্দাম একটা দুপুর কাটানোর পর। মনামি নগ্ন শরীরটা এলিয়ে ছিল সোফার উপরে। সামনে খাটের কোনায় বসে সেটা দেখতে দেখতে নবীন বলেছিল, 'আউটস্ট্যান্ডিং ফিগার! ডু ইউ এভার থিঙ্ক অ্যাবাউট মুভি?'

'নায়িকা?' একটু তাচ্ছিল্যের সুরে প্রশ্ন করেছিল মনামি, 'আই ক্যান অ্যাক্ট বেটার দ্যান বলিউডস অ্যাকট্রেস।'

'নো নো! বলিউড কেন? সিম্পল ভিডিয়ো।' নবীনের বাংলায় নেপালি টান সামান্য। মনামির উপর ঝুঁকে পড়ে তার বুকে একটা হাত রেখে সে বলল, 'ভিডিয়ো ডিরেক্ট দুবাই চলে যাবে। ইন্টারনেটে যেসব সাইটে আসবে, সেগুলো গোপন সাইট। হাফ অ্যান আওয়ারের চারটে ভিডিয়ো। ফিফটি থাউজ্যান্ড।'

'হোয়াট!' উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠে বসেছিল মনামি।

'বাট ইউ টু ওয়েট টিল উইন্টার।'

এটা অগাস্ট মাসের ঘটনা। এখন নভেম্বর ফুরাতে চলল। নবীন রাইয়ের সঙ্গে চার-পাঁচবারের বেশি শরীর বিনিময় হয়নি মনামির। সে বেশ ধীরস্থির। আর টাকার ব্যাপারে রাজেশের উলটো। এসব ভাবতে ভাবতে আলস্যে বিছানায় পাশ ফিরল মনামি। ফোনটা বাজছিল। ঢুলুঢুলু চোখে ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল সে। নবীন। ঘুমের জড়তা কাটিয়ে সে বিছানায় উঠে বসে ফোনটা ধরল।

'নেক্সট উইকে শুট করব। এইট্থ আর নাইন্থ।' নবীনের শান্ত গলা শোনা গেল ওপার থেকে।

(ক্রমশ)

জলরঙের দুপুর

রানা সরকার

এ সময়ে সুবর্ণ সেন প্রান্ত ডুয়ার্সের পুরানো এই মহকুমা শহর ছেড়ে কলকাতার নিবিড় দক্ষিণের শহরতলিতে ছেলের বাড়িতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান। মফস্‌সলের এই মহকুমা শহরটির কলেবর বেড়েছে। সম্প্রতি জেলা শহরে উন্নীত হওয়ার দরুন এক সময়ের রেলের শহর, চায়ের দেশের শহর আলিপুরদুয়ার দ্রুত গুছিয়ে নিখুঁত নগরায়ণের দিকে এগিয়ে চলেছে...। সুবর্ণ সেন এখানকার কলেজটিতে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে অবসরের সময় জুড়ে আরেক প্রবাহে জীবনের খেয়াতরিতে উঠে বসেছেন। ঝাপসা চোখে বদলে যাওয়া এই জনপদকে তেমন করে চিনে নিতে পারেন না সুবর্ণ। স্মৃতি হাতড়ে প্রায়শই এই এলাকাকে একটু অন্যরকম করে গড়ে তোলার তাগিদে সুবর্ণ এই গলিপথের নাম ‘শরৎ সরণি’ করার একটা বেসরকারি প্রস্তাব পুরসভার বিবেচনা এবং অনুমোদন চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবটি অনুমোদন পেয়েছে বহুদিন আগে। এখন শরৎ সরণির প্রশস্ত গলিপথের ফলক থেকে একটু দূরে সুবর্ণ সেনের বাড়ি। অধ্যাপক সুবর্ণ সেন এখানেই থাকেন। ছায়া-ঘেরা দোতলা বাড়িটির আলাদা কোনও নাম নেই। বাড়ির সামনে ছোট একটা লনের দু’পাশে ডুয়ার্সের সুগন্ধি ‘ফিনসিসিয়া’, অরণ্যের গোধূলিতে বেড়ে ওঠা অচেনা অর্কিড ও অন্য রকমের ফুলের বিচিত্র সমাহার দিয়ে গড়ে উঠেছে এই লনটি। দু’টি সিঁড়ি টপকে এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে হয় ডুয়ার্সের নির্ভুল মানচিত্রটিকে। বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো ডুয়ার্স নামাঙ্কিত এই মানচিত্রটিকে সবুজের এক খণ্ড চিত্র ভেবে ইদানীং সুবর্ণ সেন তাঁর সাধের গড়া এই অরণ্যের সংসারটাকে হারিয়ে যেতে দেখেন। একেবারেই পাশ ঘেঁষে বহুতলা ফ্ল্যাটবাড়ি শহরের অচলায়তনকে ভেঙে দিচ্ছে প্রতিদিন।

অপার বিস্ময়ের এক তারুণ্যের সীমারেখা সত্তরোর্ধ্ব অধ্যাপক সুবর্ণ সেনের চাহনিতে মাঝেমধ্যে ঝলসে উঠে পাহাড়, অরণ্য আর চা-বাগানের মুগ্ধ সমতলের বাড়িগুলো ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে আজ অবধি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যতিক্রমী শুধু লাগামবিহীন অপরিকল্পিত নির্মাণ। ভূমিকম্পের কারণে সতর্কীকরণ মেনে এ অঞ্চলে ইটে গাঁথা বহুতল নির্মাণ আর নিষিদ্ধ থাকছে না এখন...। ডুয়ার্সের বাড়িঘর নিয়ে এক সময়ে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন সুবর্ণ সেন। নিজের দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়ে তাঁর বাড়িটিকেও পুরানো স্থাপত্যে নির্মাণ করিয়েছিলেন। নতুনের প্রতি আরেক সহজাত বোধ থেকে যায় সুবর্ণ সেনের। এক দ্বান্দ্বিক চেতনায় সুবর্ণর নতুন এসে তার সঙ্গে কথা বলে।

পাহাড়তলির নীল বর্ণের ট্রেন দূরের ছায়াপথ ভেঙে শাল, সেগুন, কদমচাঁপার অরণ্য পেরিয়ে যায়। বাতানুকূল কামরা থেকে কখনও বা ধু-ধু ডুয়ার্সের প্রান্তীয় পথ কাছে এসে হারিয়ে যাওয়া নিখুঁতভাবে পরখ করেন রেল ভ্রমণের এই যাত্রীটি। ডুয়ার্সের এক-একটি বন্দর সময়ান্তরে কাছে আসে। বর্ণময় স্টেশনবাড়িতে এসে নীল বর্ণের ট্রেনটির সাময়িক বিরাম। এভাবেই সুবর্ণ আরণ্যক জনপদের বন্দরগুলোকে ছুঁয়ে মহানগরের পথে এগিয়েছেন। বছরে এক-দু’বার এরকম রেল ভ্রমণ সুবর্ণকে দু’টি বিপরীত জনপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়...। চায়ের দেশের জলছবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারেও সুবর্ণ সস্ত্রীক এখন কলকাতার যাত্রী।

মহানগরের এই যাত্রাপথে স্মৃতিবন্দি সুবর্ণ, নদীর নামের সঙ্গে অরণ্যকে চিনে এসেছে এতকাল। অরণ্যের বুক চিরে সড়কের সাবেকি অবস্থান একইভাবে আজও বুক পেতে ধরে রেখেছে এক-একটি দীর্ঘ পথ। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে কলকাতার সরাসরি কোনও রেল যোগাযোগ এতদিন ছিল না। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এখন শীতের গোধূলিতে অথবা পলাশ-ঝরা বিকেলে স্টেশন ছেড়ে তার যাত্রা শুরু করে। এখন এখানকার আকাশ ঘুমের পাহাড় থেকে মেঘ ডেকে নেয়, তাই বৃষ্টি। আজ নোটিশবিহীন হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল। অরণ্যের প্রবেশদ্বারে দমনপুর ফ্ল্যাগ স্টেশনটি এখন নিরুত্তাপ। সবুজ আলোর কোনও সংকেত থাকে না এখানে। এক সময়ে অরণ্যের নির্জন দুপুরে মালগাড়ির গার্ডবাবু ফ্ল্যাগ নেড়ে এই পথে ট্রেন নিয়ে তার অভীষ্ট বন্দরগুলিতে যাতায়াত করেছে কতবার! অদূরে নিঃশব্দের নদী নোনাই। সেই স্টেশন রাজাভাতখাওয়া, যেখানে যুদ্ধ শেষে সন্ধিস্থাপনের পর কোচ রাজার সঙ্গে ভুটান রাজার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের আয়োজন হয়েছিল। একই সঙ্গে দুই রাজা ভোজে অংশ নিয়েছিলেন। সেই থেকে এই বনবসতির নাম হয়েছে রাজাভাতখাওয়া। রেলের শহর ছেড়ে এরকম আরণ্যক ছায়াপথে বনমহলের আশ্রমিক ঘরবাড়ি মেঘ ও রোদ্দুরে চেয়ে থাকে। কালচিনি, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা ছেড়ে তোর্সা নদীর রেল সেতু। তোর্সার দক্ষিণ উপকূল জুড়ে জলদাপাড়ার বিস্তার। এ পথে অনন্ত কৃষ্ণচূড়া আর মাদার গাছের আধিক্যে আজও হাওয়া ফেরে বসন্তকালীন। মাদারিহাট দূর ও কাছের মাঝে একটা সম্পর্কের সেতু এই জনপদটিতে গড়ে তুলেছে।

বসন্তের এই বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে ডুয়ার্স

আজ নোটিশবিহীন হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল। অরণ্যের প্রবেশদ্বারে দমনপুর ফ্ল্যাগ স্টেশনটি এখন নিরুত্তাপ। সবুজ আলোর কোনও সংকেত থাকে না এখানে। এক সময়ে অরণ্যের নির্জন দুপুরে মালগাড়ির গার্ডবাবু ফ্ল্যাগ নেড়ে এই পথে ট্রেন নিয়ে তার অভীষ্ট বন্দরগুলিতে যাতায়াত করেছে কতবার! অদূরে নিঃশব্দের নদী নোনাই।

পেরিয়ে যেতে সুবর্ণ দেখছে মুজনাই নদীর আপাতবিচ্ছেদের ছবি। শীর্ণতোয়া মুজনাইয়ের দু'দিকে চর জেগে উঠেছে। নদী মুজনাইয়ের নামে রেল স্টেশন মুজনাই এখন বেশ গোছগাছ। অকালবর্ষণের পর স্টেশনবাড়িতে সুস্নাত ও মৌন মনে হচ্ছে...। এই জলমান নীল বর্ণের এক্সপ্রেস ট্রেনটির গতি আরও বেড়ে উঠেছে। ডান দিকে জানালার কাছে এসে বৃষ্টি-ভেজা পড়ন্ত বিকেলে সুবর্ণ দলগাঁও স্টেশনের আগে ইউরোপিয়ান ক্লাবের গলফ গ্রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে নিবিড় উত্তরের চায়ের সবুজকে খুঁজে দেখছিলেন। মধ্য যৌবনে সুবর্ণর লেখা কবিতা 'বৃষ্টি' আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে—

'কখনও বৃষ্টির কথা মনে হলে—,
পাহাড়ি ঢলের সাথে নেচে ওঠে জীবনের
  বিচিত্র স্পন্দন;
প্রথম বর্ষণের দিনটিতে বৃষ্টি নামের মেয়েটির
  সহজ আলাপন,
ভিজে দেওয়ালের মাঝে বন্দি কফিন—,
শীতল হতে শিখিয়েছিল আমাকে।
আমি ভাল আছি এই কথা মনে পড়তেই—,
আজ বৃষ্টি এল।
আজ বৃষ্টি এল বনবস্তিটিকে ভিজিয়ে
কালজানির ওপার হতে।

মেঘ এসে আজ আবার বৃষ্টি নামাল—
বহুদিনের মরু অতীতকে নিংড়ে ধুয়ে উঠল
  অস্নাত বন্দর।'

আধিভৌতিক ডুয়ার্সের সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। নীল দ্রুত যানটি ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে সীমান্ত প্রান্তিকে। এখানে রেল সড়কের পাশে গহিন অরণ্য...। বন্য হাতি ও গন্ডারের দল রাতে আঁধারে বন ছেড়ে বেরিয়ে রেল সড়কের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে যায়। রেলে কাটা পড়ে। বন্য প্রাণীর মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন রেলগাড়ির স্বচ্ছন্দ গতিকে ইদানীং নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সবুজ অরণ্যের এই প্রান্তিক পথমেরু রাতের আঁধারে অচেনা হয়ে ওঠে। দূরের কোথাও মাদল-শব্দে কাঁপে রাত। এই ডুয়ার্স পাহাড়, অরণ্য আর সবুজের মখমল বিছানো চায়ের উপত্যকায় মেঘ-রোদ্দুরও হঠাৎ বৃষ্টিতে রং বদলে নিচ্ছে প্রতিদিন...। ঘন বাদলের ছায়ামুক্ত ডামডিম, ওদলাবাড়ি মালবাজার দিনশেষের আরেক রূপান্তরে জোনাক আলোয় গা ঢেকে আছে। নরম আবেশ ভেঙে স্টেশনের ঘণ্টা বাজে। দূরে গুলমার চারদিকে ঘেরা বনানীর মাঝে অথই নিঝুমের বৃষ্টি, শুধুই বৃষ্টি আবার। বৃষ্টি নামের মেয়েটির সঙ্গে সেই কবে দেখা হয়েছিল সুবর্ণর। সে দিনের যৌবন-গাঙে ভরা কটালের রাতে বিপন্ন সময়ে ভাসিয়েছিল দুরন্ত জোয়ার। বৃষ্টি অথবা সাহানার জীবনের জগতে একটা অচিনপুর আড়ালেই রয়ে গেল...। এখন বৃষ্টি মাঝবয়সি সাহানাদেবী। বৃষ্টি শুধুমাত্র সুবর্ণর। এহেন পান্থসখী বৃষ্টিকে বৃত্তের বাইরে নিয়ে যেতে চায় সুবর্ণ। রাত আরও বেশি হলে একসময়ে বৃষ্টি এসেছিল আবার। অরণ্য সংলগ্ন পাড়ায় বৃষ্টির তুমুল উৎসবে আর যারা জেগেছিল, তাদের কেউই জানল না, সারারাত এক স্বপ্নময় অতীত মনের দুয়ারে এসে সুবর্ণ ও সাহানাকে সেবক পাহাড়ের বৃষ্টির বিকেলশেষে সে দিনের গোধূলির গোপন আলোছায়ায় ফিরিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। সুবর্ণর স্বগতোক্তি আজ এত বছর পরে সুখস্মৃতির এক দরদি উচ্চারণ। 'বৃষ্টি, সে দিন সেবক পাহাড়ের ঝরনায় স্নান সেরে মুক্ত হাওয়ায় তুমি তোমার আঁচল শুকিয়ে নিয়েছিলে। জলা পাহাড়ের বিকেলে এক জলপরিকে দেখেছিলাম সে দিন আমি।'

বৃষ্টি— 'অরণ্য বেলায় আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের ভালবাসার যৌথ বাগান নষ্ট হয়নি এতটুকু। কোথাও হয়ত আড়াল করে আছে।'

সুবর্ণ— 'তুমিই তো আমার আলো সুবর্ণ। আমাদের যৌথ বাগানে এক গুণকিশোরী ও একটি শুভ্র শঙ্খ জাগিয়ে রাখে আমাদেরকে।'

সুবর্ণ— 'আমাদের সন্তানদের নামকরণের সার্থকতায় সাংসারিক বিতর্কের সংলাপে তুমি আজও আমার গল্পের নায়িকা রয়ে গেলে বৃষ্টি।'

রাতের অন্ধকারে নীল বর্ণের ট্রেনটি সমতলের ডুয়ার্স ছেড়ে এসেছে অনেকক্ষণ। একটা মোহময় অতীতের হাতছানিতে মনভুবনের ছায়ায় এসে দু'জন কিছুক্ষণের মুখোমুখি...। কেউই ঘুমাতে পারল না। বৃষ্টির নরম আবেশ আর স্পর্শকাতর হিমেল বাতাসটুকু বাতানুকূল কামরাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুঁয়ে গেল।

ব্যস্তবহুল শিয়ালদা স্টেশন। দেরিতে ট্রেন এসে পৌঁছানোর পর উত্তর-প্রৌঢ়ত্বের দীর্ঘদেহী মানুষটি নেমে এলেন। গত রাতের ঘুমহীন ক্লান্ত চোখ দু'টি বড় বেসামাল হয়ে উঠেছে। খুব চেনা অথচ কেমন অচেনা এক লোক আঙিনায় সুবর্ণ হাঁটছেন। শরীরে বার্ধক্যের উপস্থিতি টের পান সুবর্ণ। এই জনারণ্যে আরেক হিসেবনিকেশের অতীত ঘুরে দাঁড়ায়। ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলিতে মাঝেমধ্যে শহর থেকে মহানগরে ফিরে আসার ব্যস্ত আয়োজনে সুবর্ণ কতটা সাবলীল ছিলেন একদিন! বেপরোয়া একা সুবর্ণ প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে স্বচ্ছন্দে মেসবাড়িতে ঢুকে পড়তেন। এখন স্টেশনের এই প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যেতে এত সংশয়। 'বাবা সাতসকালের ট্রেনটা এত দেরিতে পৌঁছুল, সে জন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব হল। এমনটা না ঘটলে অন্য একজনকে পাঠাতে হত।' ছেলে শঙ্খর মুখোমুখি হয়ে সুবর্ণ বললেন, 'তুমি না এলেও আমি ও তোমার মা ঠিক চলে যেতে পারতাম।' 'একটা ট্যাক্সি ধরার দীর্ঘ লাইনে তোমরা শেষ অবধি অসুস্থ হয়ে পড়তে, ট্যাক্সি অধরাই রয়ে যেত।' 'তোমার কি আজ আপিস নেই?' পুত্র শঙ্খর প্রতি সুবর্ণর এই জিজ্ঞাসায় তাৎক্ষণিক কোনও উত্তর ফিরে এল না। 'ছুটি জমিয়ে রাখাতে সঞ্চয়ী হতে হয় মা। প্রয়োজনে এই জমানো ছুটি অনেকটা নিশ্চিত রাখে। আমি আজ অর্ধেক দিনের ছুটি নিয়েছি। এই হাফ সি.এল. নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে এলাম।' 'ভাল করেছিস বাবা। শিয়ালদা থেকে উত্তর-মধ্য ঘুরে দক্ষিণে তোদের ওখানে পা রাখা কি চারটি খানিক কথা?' সুবর্ণ-জায়া সাহানা, পুত্র শঙ্খকে যখন আদরের সঙ্গে কথা ক'টি বলে ফেলেছেন, ততক্ষণে টুকটুকে লাল অলটো গাড়িটি দক্ষিণ-পূর্বের চওড়া স্টেশন চত্বর ছেড়ে গাড়ির মিছিলে ঢুকে পড়েছে...।

গাড়িতে বসে সুবর্ণ গত কুড়ি ঘণ্টায় শহরে চলমান জীবনের ছবির মধ্যে নিজেকে দেখছেন। এ শহরে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের একটা স্থায়ী ঠিকানা গড়ে উঠেছে। সেখানে তাঁরই ছেলে শঙ্খশুভ্র সেনের প্রযত্নে নামটি যুক্ত হয়ে তাঁর নিজস্ব ঠিকানা লেখা হয়। সুবর্ণর স্থায়িত্ব তো দু'জায়গাতেই। একটা তৃপ্তি এসে সুবর্ণকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। লাল রঙের অলটোটা ছুটছে...। কোথাও ট্রাফিকের শাসন মেনে সবুজ সিগন্যালের অপেক্ষায় গাড়িটি কিছু দূর দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার। শঙ্খ এতক্ষণ ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে মা সাহানাদেবীর সঙ্গে কথা বলছিল। সাহানাদেবীর ছড়া, সাম্প্রতিক লেখা কোনও গল্প কিংবা উপন্যাস ভাল লাগলে তার চরিত্রচিত্রণকে মনের কোণে আগলে রাখেন অনেকদিন। চরিত্রগুলোর সঙ্গে একটা সহজ আলাপন গড়ে ওঠে তাঁর। নতুন আঙ্গিকের ভাললাগা কোনও লেখা চোখে এলে ছেলেকে তা পড়তে বলেন। আজ শঙ্খ মাকে তার সদ্য পড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসটিকে জীবনকথার নামান্তর বলে টুকরো একটি কথাকে যুক্ত করে। মা সাহানাদেবীকে জানাল, 'মা, গত রাতে তোমরা যখন ট্রেনে, তখন "অর্ধেক জীবন" উপন্যাসটির বাকি অংশটুকু শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে জানলাম ট্রেন দু'ঘণ্টা দেরিতে চলছে। আমি আজ অর্ধেক দিনের ছুটি নিয়েছি— তোমাদের সঙ্গে ছুটি কাটাব।' সাহানা দেবী বললেন, 'এ কেমন তোর ছুটি রে শঙ্খ?' অনেক হেসে শঙ্খর উত্তর বেরিয়ে এল, 'অর্ধেক জীবনের মতো।' গাড়ি চলছে দক্ষিণ-পূর্বের এই জনারণ্যের ব্যস্ত বুক চিরে লং রুটের এইট বি বাস স্ট্যান্ডের লাগোয়া যাদবপুর থেকে পূর্বের বাঘাযতীন

মোড়ের দিকে...। সুবর্ণর মনে হল, এক অবিশ্বাস্য জনস্ফীতিতে জীবনের জগতের বহমান স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে। নিবিড় দক্ষিণের এই জনপদ কোথাও মৌন নয় এখন...। গাড়ি বাঘাযতীন মোড়ের ফ্ল্যাটবাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ানোর পর যাত্রাপথ শেষ হয়ে এল। সুবর্ণ এখন মহানগরের নাগরিক। তাঁর অস্তিত্বের দ্বিতীয় বাসভূমিতে আজ আর বৃষ্টি নেই। মহানগরের বৃহত্তর দক্ষিণের এই বিস্তৃতি সুবর্ণর নাগালের বাইরে থেকে যায়...। তাঁর অস্তিত্বের দ্বিতীয় বাসভূমি সকাল-বিকেল খুব দ্রুত অন্যত্র হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। বহুতলের ফ্ল্যাটবাড়িগুলির এসব জায়গার একটা অতীতকে স্পর্শ করে উড়ে যায় অচেনা একঝাঁক পাখি। একসময়ে জলাভূমি ভরাট করে কংক্রিটের জঙ্গলে এ শহরে গৃহস্থালি গড়ে ওঠার পর ভুল পথে পাখিরা আজও সাঁঝ-সকালে উড়ে আসে। প্রান্তীয় ডুয়ার্সের জেলা শহরের নগরায়ণ হলেও এখনও আকাশপথে মেঘলা বিকেলে উড়ে আসে বক্সা পাহাড়ের বুনো পায়রার ঝাঁক। এ শহরের বট-পাকুড়ের পাশে মুকুলের দিন হেসে ওঠে...। পাখিদের এলোমেলো ফিরে আসা শুরু হয়। বক্সা ফরেস্ট রোডের সংযোগ সাঁকোগুলি পেরিয়ে রাতের আঁধারে শাবকসহ সুচতুর বাঘিনি শহরে আশ্রয় নেয়। এরই মাঝে মানুষের সংসারে আরেকটি মানুষ আসে। অদ্ভুত এই সহাবস্থানে দীর্ঘ এক আরণ্যক জীবনের ছায়া নগরায়ণের কৌলীন্যে এসে মিশে থাকে। শহর-নগরের মেরুকরণের পর ফ্ল্যাটবাড়ির ঝুলবারান্দায় সুবর্ণ আজ এই দক্ষিণ শহরতলির আকাশের দিকে তাকিয়ে এক ব্যথিতার সন্ধ্যাকে নামতে দেখলেন! ডুয়ার্সের শহরে সুবর্ণর সাতসকাল, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পথে হঠাৎ গোধূলি কিংবা ভেজা সাঁঝের বেলায় জলছবির পুরু অ্যালবাম ‘বিচিত্র ডুয়ার্স’-এ কোন শহরে বন্দি হয়ে এসেছে। সেইসব ছবি নিয়ে সুবর্ণ হাওয়ামহলের এক চিত্র প্রদর্শনীর ডাক পেয়েছেন। কলকাতা মহানগরের কোনও নির্ধারিত প্রদর্শনী মঞ্চে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। হেরিটেজ ভবনগুলির ভগ্নপ্রায় কোনও এক বাড়িকে বেছে নিয়ে বাড়ি সংলগ্ন মুক্তাঙ্গনটিকে হাওয়ামহল রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ডুয়ার্স তথা চায়ের দেশের বাছাই করা জলছবিকে সাজিয়ে নেওয়ার আগে আরেকটি ছবি, যা মহানগরের ব্যস্ত কোলাহলের ভেতর মৌন এক নম্রতায় লুকিয়ে আছে। এ ছবি জলরঙে বিমূর্ত আলপনায় ফুটিয়ে তোলার জন্য সুবর্ণ মাঝদুপুরে কলেজ স্ট্রিটে খুবই সন্তর্পণে এগিয়ে-পিছিয়ে একসময় তাঁর দেখা বইপাড়াকে দেখেছেন। ট্রাম লাইনটা ধরে এখনও দুপুরের বাধাহীন ট্রামে চেপে কলকাতার নীতা নেমে আসে কলেজ স্ট্রিটে। ভৌতিক ক্যামেরায় ধরে রাখা অশ্বারোহী কবি পুরু অ্যালবাম থেকে হাত বদলে সোজা কফি হাউসে। বইপাড়ার সদর রাস্তার সামনের ছোট্ট সংযোগের গলিতে দু’পা এগিয়ে সিঁড়ি ভেঙে কতদিন পর সুবর্ণ উঠে এলেন খোলা দুয়ারের কফি হাউসে...। সঙ্গী অরুণাভকে নিয়ে সুবর্ণ আজ কফি হাউসের কোলাহলকে নিঃশব্দে মানিয়ে নিয়ে মাঝবরাবর একটি টেবিলে দু’জন মুখোমুখি এখন...। কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগটি টেবিলের একদিকে রেখে সুবর্ণ অরুণাভকে বললেন ‘কফির আড্ডার বেলাটা বুঝি ঠিক এখন নয়।’

অরুণাভ বাইরের চড়া রোদের দুপুর কিছু আগে পেরিয়ে এসেছে। এখন এখানে কোথাও কোলাহলে বারণ নেই। মৃদু স্বরে অরুণাভ সুবর্ণকে গানের কথাটা ফিরিয়ে দিল আবার— ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...’।

জানো অরুণাভ, একসময়ে আমার অর্ধেক জীবন থেকে সেই অতীতটা খুব দূরের ছিল না। এখন তো সেগুলো সব দূরের আলো-আঁধারিতে ঢেকে আছে। এখন এই কফি হাউস আমার চোখে আনন্দপুর পাঠশালা। গভীর উপলব্ধি থেকে সকৌতুক কথা ক’টি অরুণাভর সামনে রেখে সুবর্ণ কফি বিরামে একটু জুড়িয়ে নিচ্ছেন...। ছবি প্রদর্শনীতে সুবর্ণর সহযোগী অরুণাভ কফি হাউসের এই বিচিত্রকরণকে তার আঁকা ছবির ক্যাপশন হয়ে উঠবে কি না— এই ভেবে আনন্দপুর পাঠশালাকে আপাতত বুকের এক কোণে সরিয়ে রাখল...।

আর্ট ব্যাগটি খুলে ছবি স্কেচ করার পেনসিল ও আর্ট পেপার হাতে নিয়ে সুবর্ণ এই চলমান জীবনের ছবিকে ঘষে-মেজে নিচ্ছেন...। দুপুরের খণ্ডচিত্রে ব্যস্ত কোলাহল থেকে পালিয়ে আসা কিছু ক্লান্ত মুখের উদ্ভাস রেখাচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছে। চিত্রকর সুবর্ণ সেনের স্কেচ অঙ্কন থেকে জলরঙে তুলে আনার এই দুপুরের এক-একটি ছবি। এখন কফি হাউসে বিরামহীন জলসার ছবি আঁকা হয়। সেই যে সুদূরে আনন্দপুরের পাঠশালায় জংলা দুপুরে ঘাসফরিঙের মেলায় সুবর্ণর ছবি আঁকার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল, তা মনে হতেই বিপরীত এক জলরঙের দুপুর নেমে এল বইপাড়ায় কফি হাউসে...।

চিত্রকর সুবর্ণ সেনের চিত্র প্রদর্শনীর আজ প্রথম দিন। উত্তর কলকাতার গঙ্গার ধারে প্রাচীন এক অভিজাত বাড়ির বিশাল আঙিনাকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। এখানেই প্রদর্শনীর চিত্রশালাটি হাওয়ামহল নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছে এখন। পথনির্দেশিকায় হাওয়ামহলের চিত্রশালাকে খুঁজে পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, সে কথা ভেবে চিত্রশালার অস্থায়ী কার্যালয়ে টেলিফোন বুথ এসেছে। একটু

চিত্রকর সুবর্ণ সেনের স্কেচ অঙ্কন থেকে জলরঙে তুলে আনার এই দুপুরের এক-একটি ছবি। এখন কফি হাউসে বিরামহীন জলসার ছবি আঁকা হয়। সেই যে সুদূরে আনন্দপুরের পাঠশালায় জংলা দুপুরে ঘাসফরিঙের মেলায় সুবর্ণর ছবি আঁকার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল, তা মনে হতেই বিপরীত এক জলরঙের দুপুর নেমে এল বইপাড়ায় কফি হাউসে...।

অন্যরকমভাবে চিত্র প্রদর্শনীর স্থানটি সেজে উঠেছে আজ। ‘জনারণ্যে মহানগর ও মৌন ডুয়ার্স’— এই ভাবনায় সুবর্ণর আঁকা ডুয়ার্সের এক-একটি জলছবি আর্ট গ্যালারির দখল নিয়েছে। ডুয়ার্সের জল হাওয়ার এক পর্যটনী বিকেলের ছবির বিপরীতে ‘শেষ শব্দ কলকাতা এখন’— এই শিরোনামের ছবিটি জীবনের মধ্য বসন্তের এক ব্যাকুল মেলবন্ধনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মধ্য যৌবনের সময়কাল ধরে সুবর্ণর আঁকা ছবিগুলো সেসব দিনের অহংকার যেন...। প্রদর্শনীর আঙিনার এক কোণে বসে সুবর্ণ তাঁর অহংকারের দিনগুলোকে ভাবনায় ফিরিয়ে আনছেন...। সদ্য আঁকা গতকাল কফি হাউসের দুপুরে স্কেচ থেকে বেরিয়ে আসা জলরঙের দুপুর, দিনের মধ্যাহ্নে জেগে উঠেছে বহুক্ষণ আগে। সুবর্ণ সোজা উঠে আর্ট গ্যালারির সমুখে এগনোর মুখে সাহানাকে দেখতে পেলেন...। এই জলরঙা দুপুরে সাহানা বড় নমনীয় রূপে সেজে আছে। ওর এক সময়ের কুয়াশা ভেজা নীল আঁচলটি উড়ছে মধ্য দিনের জোয়ারের গাঙ্গেয় হাওয়ায়। সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে আজ সাহানার এক স্বগতোক্তিতে নিয়ে এল তার নিজস্ব অহংকার। ‘সুবর্ণ, অর্ধেক জীবন জুড়ে তোমার আঁকা ছবিগুলোকে এত গভীরভাবে দেখিনি কখনও। আজ মনে হচ্ছে জীবনের কিছু সত্যি ছবিতে লুকিয়ে থাকে।’ সুবর্ণ খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ কিছুক্ষণ...। টুকরো মেঘগুলো নিরুদ্দেশের পথে ছবির জলসা থেকে দূরে, অনেক দূরে হারিয়ে যাচ্ছে...।

যাদের কথা কোনও রিপোর্টে নেই

ডুয়ার্সের মানবাধিকার মানে এখানকার বন্ধ চা-বাগান শ্রমিকদের দুর্দশার কথা, আদিবাসীদের জমিতে গড়ে ওঠা ইটভাটার কথা, বনবাসীদের যন্ত্রণার কথা আর এখানকার ভূমিপুত্রদের বঞ্চনার কথা। এসব নিয়ে অনেক প্রবন্ধ, বই, গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কিছু হয়েছে? ক'জন পড়ে দেখে সেগুলি? আমিও যদি এখন ডুয়ার্সের মানবাধিকার নিয়ে লিখতে বসি তাহলে পাঁচটা কাগজ, দশটা বই আর ইন্টারনেট খুলে নানা সাইট দেখে তথ্য সাজিয়ে বেশ জম্পেশ একটা লিখতেই পারি। কী হবে? যাঁরা লেখাপড়া করেন, তাঁরা সকলেই এই বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে কমবেশি ওয়াকিবহাল। এমন তো নয় যে, একসময় ছিল যখন ডুয়ার্সের সব মানুষ সারাদিন মুখে হাসি, বুকে বল আর তেজে ভরা মন নিয়ে ঘুরে বেড়াত! কেবল বঞ্চনার চেহারা বা কায়দা ও প্রবঞ্চকদের পদবি বদলেছে। বঞ্চনা যেমন ছিল, তেমনই আছে থাকবে। সে ক্ষেত্রে আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে মশাই আপনারা মানবাধিকার নিয়ে আন্দোলন-ফান্দোলন করে এতদিন কোন মেলন ক্রাশ করলেন? হুম্ম, বেঠিক কিছু বলেননি। কিন্তু আমি অতটা মা ফলেষু নই। হয়ত কিছু করতে পেরেছি। হয়ত তা যৎসামান্য। ঘা-পাঁচড়া হওয়া বন্ধ করতে পারিনি, তবে তার জন্য যে মলম আছে আর তা ঠিকঠাক ব্যবহার করলে রোগ কমে, সেটা অনেককেই বোঝাতে পেরেছি। তাই এখন যখন হঠাৎ কারও কাছ থেকে ফোন পাই, কাকু বা দাদা, কাল সন্ধ্যায় বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। সঙ্গে কোনও মেয়ে পুলিশ ছিল না। আমরা সকলে এক হয়ে পুলিশকে বাড়িতে ঢুকতে দিইনি। তখন বুঝি কিছু হয়েছে। মানুষ একটু হলেও নিজের অধিকার বুঝতে শিখছে। একটু তৃপ্তি হয়। তবে এসব সামান্য কাজ করতে গিয়ে বেশ মজাদার চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেগুলির হয়ত সে অর্থে বৌদ্ধিক মূল্য তেমন নেই, কিন্তু শিক্ষণীয় কিছু সারসত্তা আছে। বরং সেইরকম কিছু কাহিনি এখানে বণ্টন করে নিই। ঘটনাগুলি সবই বাস্তব, ১০০ শতাংশ খাঁটি। কিন্তু প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে নামধাম একটু পালটে দিলাম। বলা যায় না, প্রকাশনার অধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে।

জনহিতার্থে পুলিশের স্পিড মানি

আজ থেকে প্রায় বছর বারো আগের কথা। ময়নাগুড়ির সন্নিহিত কোনও এক পতিগৃহে নিপীড়িতা গ্রামের বধূ ও তার অসহায় পিতা এলেন একদিন। ময়নাগুড়ি থানাতে তাঁরা প্রায় দশ দিন হয়ে গেছে ৪৯৮এ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন, কিন্তু পুলিশের তরফে কোনও সক্রিয়তা দেখতে পাননি। দু'দিন আগে বাবা মেয়েকে নিয়ে খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। পুলিশ নাকি উলটে ধমক দিয়েছে, তারা কেন মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এখন পুলিশ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এর একটা মিটমাট করে দিতে পারে। কিন্তু খরচা আছে, এমনি এমনি হবে? বধূ সন্ত্রস্ত, সে আছে বাপের বাড়িতে, সকাল-বিকেল শ্বশুরবাড়ির লোক বাড়ির বাইরে এসে বা রাস্তায় বাজারে নানাভাবে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। বাবা বেচারা মেয়েকে না পারছে ফেরত পাঠাতে, না পারছে জামাই-বেয়াইদের ভাইগিরি সামলাতে। শুনলাম, কাগজপত্রের নকলগুলি নিয়ে নিলাম, প্রমাণ হিসেবে কাজে আসবে, আর-একটা দরখাস্ত। বললাম, এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিতে। দু'দিন বাদে ময়নাগুড়ি থানার আইসি, বড় সজ্জন মানুষ ছিলেন, আমরা যাওয়ামাত্র সদরে বসালেন। চা বলাই ছিল। একবার হাঁক দিতেই এসে গেল। এক গাল হেসে বললেন, 'না এলেও হত, আপনি ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজিকে আটক করেছি। আসলে কী জানেন, আমরাও তো মানুষ, একটা সংসার ভেঙে যাবে— এটা কে-ই বা চায় বলুন? সে জন্যই একটু চেষ্টা, একটু কনসিলিয়েশন, একটু কাউন্সেলিং, তাই একটু সময় লাগছিল। তা জামাই বাবাজিকে আমি বলে দিয়েছি, এবার ঘানি টান। ভাবতেই সময় লাগে এত! বউ পেটাবে আর টাকা না দিয়ে পার পেয়ে যাবে, সেটা আমি থাকতে হবে না। হয় এখানে ক্ষতিপূরণ দেবে, না হয় উকিলকে, যেটা তুমি ভাল বোঝো। তা এসব গ্রামের গোঁয়ার লোক ভাল কথা শুনবে কেন। এখন বোঝ!'

আমি এতক্ষণ ঠোঁটে এক ফালি হাসি ঝুলিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। এবার সুযোগ পেয়ে বললাম, 'কীসের টাকা? আপনারা এখানে কোনও টাকা নেন নাকি?'

আইসি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'না না, আপনি যা মনে করছেন তা নয়। ওসব ঘুষ-টুস না। ছি ছি, কী যে বলেন। আমরা ওদের কাছে টাকা চেয়েছিলাম ওই বেচারা মেয়েটার হাতে দেবার জন্যই। মানে মারধর করার ক্ষতিপূরণ আর কি? মামলা করে ক্ষতিপূরণ, খোরপোষ পেতে পেতে দেখবেন মেয়েটা বুড়ি হয়ে যাবে, বাপটা হয়ত মরেই যাবে। তার চেয়ে এটা ভাল হত না? ভালই হয়েছে, আপনারাও এলেন, সামনাসামনি ব্যাপারটা বুঝে যেতে পারছেন। এরা তো একটু এদিক-ওদিক হলেই হল অমনি অভিযোগ।'

—কিন্তু আমরা শুনেছি যে, মেয়ের বাবার কাছ থেকেও নাকি আপনারা টাকা চেয়েছেন!

—ইশ্, আপনারাও না, এত অবুঝ হলে চলবে! এই যে কনসিলিয়েশন, কাউন্সেলিংটা করা হবে, তারপর একটা নজরদারি তো দরকার, যাতে বরটা যখন-তখন আর অত্যাচার না করতে পারে— এগুলোর একটা সামান্য হলেও তো ফিজ হওয়া উচিত, তা-ই না? উকিলের কাছে গেলেও তো টাকা লাগে। একে ঘুষ বললে বড় দুঃখ পাব।

—ঘুষ না বললে কী বলবেন তাহলে? থানায় বসে আপনারা এভাবে টাকা আদায় করতে পারেন না।

—ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক। কিন্তু কী করব বলুন, সমাজের প্রতি আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে তো নাকি? হা হা হা! নাকি সব সমাজসেবা আপনারাই করবেন?

এর পর একটু ঝুঁকে এগিয়ে এসে গলা একটু নামিয়ে বললেন, এটুকু মানুষের ভালর জন্যই নিতে হয় বুঝলেন, যেমন স্পিড মানিটা আমরা নিই।

এবার আমার আরও অবাক হবার পালা, 'স্পিড মানি! সেটা আবার কী?'

—আর কী বলব বলুন। এই যে বিচারব্যবস্থার কাছে বিচার চেয়ে আপনি যাবেন, তারপর কত হেনস্থা হবেন, ক'টা যে সুকতলা ক্ষয় হবে, সে আপনারা আমার চেয়ে বেশ ভালই বোঝেন। ধরুন কোনও ট্রাক ধরা পড়ল। কোনও বেআইনি মাল ছিল ট্রাকে। সবসময় তো আর ট্রাকের মালিক জানে না কী মাল লোড হচ্ছে না হচ্ছে! বেচারা ফেঁসে যায়। এবার ধরুন মাল যারা পাঠিয়েছে আর যাকে পাঠিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেস হবে। চার্জশিট হবে। তদন্ত হবে। আরও লোক ধরা পড়বে। সময় যাবে। আর ধরা পড়া ট্রাকটা থানাতে পচবে। যেমন হয় আর কী, হাতের

পাঁচটা আঙুল তো আর সমান না। কেউ কেউ হয়ত একটা-দুটো করে পার্টস খুলে বেচে দেবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক জুতো ক্ষুইয়ে মালিক যখন ট্রাকটা ফেরত পাবে, তখন সেটা ট্রাকের পচা খোলস ছাড়া কিছুই নয়। হেঁ হেঁ, আর একটু চা খান।

আমাদের আপত্তিতে কান না দিয়ে তিনি টেবিলের নিচে বেল-এ চাপ দিলেন। 'ওরে, চা দিয়ে যা ক'কাপ।'

—হুম, যা বলছিলাম, আমরা ট্রাকের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে নিই। তাড়াতাড়ি কেসের কাগজপত্র রেডি করে দিয়ে মাসখানেকের মধ্যে ট্রাকটা যাতে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করি। এতে কেসটাও ঠিকঠাক চলে আর অত দামি ট্রাকটাও নষ্ট হয় না। এর জন্য সামান্য প্রসেসিং ফি নিই আর কী। ওকেই আমরা ওই স্পিড মানি বলি। আপনারা নিশ্চয় একে ঘুষ বলবেন না।

—কত করে নেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

—সেটা ডিপেন্ড করে, মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত হাজারের মধ্যেই থাকে। জটিল কেস হলে একটু বেশি লাগে। খুব বেশি নিই কি? কী বলেন? যেখানে একটা ট্রাকের দাম কম করে বারো-তেরো লাখ টাকা।

আমাদের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বিদায় চাইলাম। আইসি আমাদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওদের বলবেন কোনও চিন্তা না করতে। জামাই বাবাজিকে পুরেছি। বাকি তিনজনকেও কাল-পরশুর মধ্যেই চালান করে দেব। মেয়েটার উপর কী অত্যাচারটাই না করত। ভাবা যায় না!

সেমসাইড খুনে চা-বাগান লাল

১৯৯৩ সাল। রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। ১৩ জন শ্রমিক খুন হয়ে গেল রাজনৈতিক দাঙ্গায়। আমার তো মনে হয়, এই ঘটনা নন্দীগ্রামের ঘটনার থেকে কম কিছু ছিল না। উত্তরবঙ্গের মানুষ অনেক কম প্রতিক্রিয়াশীল। এখানে রাজনৈতিক লাঠালাঠি, খুনোখুনি দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে অনেক কম। আর চা-বাগানের শ্রমিকদের এখনও আমরা মূলস্রোতের মানুষ বলে মনে করি না বলেই হয়ত ১৩ জন শ্রমিক খুন হয়ে যাবার পরেও তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া বা প্রতিহিংসা দেখা যায়নি। প্রতিক্রিয়া কম হবার আরও একটা কারণ হয়ত এই গণহত্যা প্রায় পুরোটাই সেমসাইড হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য বলি, ওই দিন রেড ব্যাঙ্ক বাগানে আশপাশের বাগান, যেমন নাগরাকাটা, লক্ষ্মীপাড়া থেকে সিটু সমর্থকদের আনা হয়েছিল রেড ব্যাঙ্কের কিছু শ্রমিককে খুন করবার জন্য। রেড ব্যাঙ্ক বাগানে বেশ কিছু শ্রমিক ওই লালে লাল সময়ে কী করে যেন সিটু ছেড়ে আইএনটিইউসি-তে যোগ দেবার সাহস পেয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে শ্রমিকদের সিটু ছেড়ে অন্য কোনও শ্রমিক সংগঠন করাটা বেশ কালিদাসমার্কা হিরো-হিরো ব্যাপার ছিল। এমন ঘটনা যাতে বেশি না ঘটে, সেটা লক্ষ রাখার জন্য বাগানে বাগানে তারকেশ্বর লোহারের মতো লোকেরা ছিল। তারকেশ্বরের গল্প না হয় পরে বলব। মোট কথা, সিটু ছাড়া অন্য দলে যোগ দিলেই তার কপালের অশেষ দুঃখ। বামনডাঙা চা-বাগানে এমনই একটা ঘটনা পেয়েছিলাম। একজন শ্রমিক আইএনটিইউসি-তে যোগ দেবার ক'দিন পরেই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল। চা-বাগানে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়াটাও খুব সাধারণ ঘটনা। এই অবস্থায় রেড ব্যাঙ্কে কুড়ি-পঁচিশজন শ্রমিক কোন সাহসে আইএনটিইউসি-তে যোগ দেয়? লাল নেতাদের ভ্রু কুঁচকে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। নরম-গরম কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। এই বাগানে কিছু বাঙালি শ্রমিক ছিল, তারাই ছিল নষ্টের গোড়া। তাদের সঙ্গে অন্য শ্রমিকরাও সাহস করেছিল হুকুম অমান্য করবার। তাই শেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পালের গোদাগুলিকে নিকেশ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু একই বাগানের লোক, যারা রোজ রোজ একসঙ্গে ভাত-হাড়িয়া খায়, মরলে কাঁধ দেয়, বিয়েশাদি করে, দুঃখে কাঁদে, আনন্দে হাসে, তারা কেমন করে রোজকার সঙ্গীকে কেবলমাত্র ইউনিয়ন বদল করবার জন্য খুন করবে? তারা সে প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। অতটা রাজনৈতিক আনুগত্য তাদের মধ্যে তৈরি করা যায়নি। অগত্যা কাছাকাছি অন্য বাগানের শ্রমিকদেরকেই এই রাজনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণ করবার দায়িত্ব দেওয়া হল। বিকেল চারটের পরে খুনোখুনি শুরু হয়েছিল। শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। আমরা পরদিন খবর পেলাম। সে দিন যেতে পারলাম না। তার পরদিন আমরা ক'জন একটা গাড়ি নিয়ে রেড ব্যাঙ্ক পৌঁছালাম। চারদিক শুনশান। কেউ বার হতে চায় না। কেউ কথা বলে না। কেউ কেউ আকারে-ইঙ্গিতে কিছু বলবার চেষ্টা করল। যাদের মরে যাবার কথা ছিল, তাদের দু'-একজনকে পেলাম। আতঙ্ক তাদের চোখে-মুখে। যারা খুন হয়েছে, তারা এদেরও আপনজন, সেই দুঃখ, আর যাদের নিকটজন খুন হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষোভ, নতুন বৈরিতা শুরুর অস্বস্তি মিশে তারা বেঁচে মরে ছিল। ঘটনা যে এভাবে ঘটতে পারে তা কেউ আঁচ করতে পারেনি। এত নিখুঁত ছিল পরিকল্পনা। একদল এসেছিল নদী পার হয়ে, অন্য দল সদর গেট দিয়ে। সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা— কিসিকো ভি জিন্দা মত ছোড়না। জান নিল তারা, কিন্তু রং চিনতে ভুল করল। গায়ে কারও রাজনীতির রং লেপা থাকে না যে।

বাগান থেকে বানারহাট থানায় এলাম। ওসি কথাই বলতে চান না। 'না, আমি কোনও মন্তব্য করব না। যা জানবার এসপি-র কাছ থেকে জানবেন।' দু'ঘণ্টা ধরে খুনোখুনি চলল আর তাঁরা কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তার কোনও সাফাই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এমনকি ক'জন মারা গিয়েছে, তাদের পরিচয় কিছুই বললেন না তিনি। থানা থেকে বেরিয়ে আসছি, বারান্দায় একজন এসআই দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বললেন, 'পরশু দুপুরে আমার ভাড়া বাড়িতে আসুন। বাজারে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।' একদিন পরে আমরা দু'-তিনজন গেলাম। সে দিন আবহাওয়া দারুণ খারাপ, কুত্তাবিলাইয়ের মতো বৃষ্টি হচ্ছিল। ওর মধ্যেই সেই এসআই-এর ভাড়া বাড়ি খুঁজে পেলাম। ভদ্রলোক চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। বড় যন্ত্রণায় ছিলেন। আমাদের কাছে কিছুটা বলে যেন একটু হালকা হলেন। যদিও সবটাই উৎস গোপন রাখবার কঠোর শর্তে। গাছ-পাথর দিয়ে রাস্তা আটকে রাখা হয়েছিল সে দিন। যতক্ষণ কর্মসূচি চলেছে, অলিখিত নির্দেশ ছিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার। তারপরও অলিখিত নির্দেশ ছিল মুখ বন্ধ রাখবার। খুন হয়ে যাওয়া ১৩ জনের মধ্যে ১০ জনই সিটুর সদস্য, অন্য বাগানের লোকেরা চিনতে পারেনি ঠিকমতো। এতজন লোককে কি বিবরণ শুনে চিনে রাখা সম্ভব? পরের দিন যে মৃতদেহটি বাগানের গাছের ভিড়ে মুখ-গোঁজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেটি অন্য আরেকটি দেহ ছিল, শুধুমাত্র আইএনটিইউসি-র। হয়ত পালাতে গিয়ে আলাদাভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল তারা। ঘটনার পরে প্রচার হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল আইএনটিইউসি-র আক্রমণে সিটুর কর্মীরা খুন হয়েছে। শহিদ স্মরণ, মিছিল চলেছিল অনেকদিন। শহিদের রক্ত ব্যর্থ হয়নি।

১৯৯৩ সাল। রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। ১৩ জন শ্রমিক খুন হয়ে গেল রাজনৈতিক দাঙ্গায়। আমার তো মনে হয়, এই ঘটনা নন্দীগ্রামের ঘটনার থেকে কম কিছু ছিল না। উত্তরবঙ্গের মানুষ অনেক কম প্রতিক্রিয়াশীল। এখানে রাজনৈতিক লাঠালাঠি, খুনোখুনি দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে অনেক কম।

অভিভাবকের অনুমোদনে কন্যা পাচার

ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা সকলেই জানে। প্রায় তিন দশক ধরে তারা তিলে তিলে মরছে। রাজনীতি করা আর মানুষকে বাঁচানো এক জিনিস নয়। রাজনীতি করলে মানুষ মরে। মানুষকে বাঁচাতে গেলে রাজনীতি দিশা হারায়। তাই রাজনীতির কারবারিরা মানুষকে বাঁচাবার ভান করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। সব মানুষ যদি ভালভাবে বেঁচেবর্তে থাকে তাহলে তো আর রাজনীতির কারবারিদের কিছুই করার থাকে না। বাইবেলে আছে, ঈশ্বর দারিদ্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ সেবা করতে পারে। সে জন্য উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকরা ধুঁকে ধুঁকে মরে রাজনীতির কারবারিদের বাঁচিয়ে রাখতে। একেবারে মরে গেলেও চলে না। শ্রমিকদের মেয়েরা পাচার হয়ে যায়, বাচ্চারা বাবুদের বাড়িতে খুঁটে ও খেটে খায়। জোয়ানরা হাইওয়েতে সন্ধ্যার পর রোজগার করতে যায়। অনেকেই উত্তরে বা দক্ষিণে মজুরি করতে যায়। এগুলি নিয়ম হয়ে গিয়েছে। তবে কিছু ঘটনা হঠাৎ এমন ঘটে যায় যে, রাজনৈতিক দল ছাড়া সাধারণ মানুষদের একটু অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তারাও ক'দিন এই শ্রমিকদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। তেমন খবরই এল একদিন, ডুয়ার্সের একটি চা-বাগানের মেয়েকে চা-বাগানের কাছেই নির্জন রাস্তার ধারে কেউ নির্যাতন করে আধমরা করে ফেলে রেখেছে। মেয়েটির ভাগ্য ভাল, কেউ তাকে তুলে সময়মতো হাসপাতালে ভরতি করে দিয়েছিল। জ্ঞান ফিরেছিল প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিন বাদে। তারপর সে কী বলেছিল, শুনতে যাবার ইচ্ছে ছিল না। এতদিন পরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ঢেউ উঠেছিল, সেগুলি মরে গিয়েছিল। আবার যারা এই ঘটনা নিয়ে মিছিল-মিটিং, জল ঘাঁটছিল, তারাও ততদিনে অন্য পুকুরের জল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘটনার পরদিন গিয়েছিলাম। ঝোপঝাড়ে ভরা মাঠের মাঝে একটা বেল গাছ। গাছের নিচের ঝোপগুলি দলাইমলাই হয়ে গিয়েছে। পাকা রাস্তা থেকে পাঁচশো মিটার দূরে বাগানের ভিতর মেয়েটার বাড়ি গেলাম। বাবা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। উল্লেখযোগ্যভাবে আসবাবের বাহুল্যহীন ঘরের দাওয়ায় মা বসে, আশপাশে কয়েকটা ছোট খুচরো ছেলেমেয়ে। ভাইবোন, একটি কিশোরী, মেজ সন্তান, ফাঁকা দৃষ্টি কাকে বলে, ওর চোখে চোখ রাখলে বোঝা যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে কী করত?'

—কাজ করত।

—কোথায়?

—দিল্লি।

পাশ থেকে আর একজন বলল, 'না না, কানপুর। উর বিয়া ছিল তো, বিয়া করতে আসছিল ছুটি লেকে।'

কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কাজ করত?'

—ঘরের কাজ।

—ঘরের কাজ মানে?

—ঘরের কাজ মতলব ঘরের সবরকম কাজ। পাশে বসে থাকা মহিলা বলল।

বললাম, 'রান্না, ঘর মোছা, বাসন মাজা—এইসব তো?'

ততক্ষণে অনেকে এসে জড়ো হয়েছে। গতকাল থেকে বাইরের বাবুরা, অখবারের বাবুরা ঘন ঘন আসছে। পুলিশও এসেছিল বেশ কয়েকবার। তাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা বলে উঠল, 'হাঁ, উসব তো করতেই হয়। তারপর মালিশ-উলিশ সব।'

এর পর আর ব্যাখ্যা চাইবার ইচ্ছা হল না। বললাম, 'ওকে কি জোর করে বা ভুল বুঝিয়ে কেউ নিয়ে গিয়েছিল?'

—না না, জোর করবে কেন? একজন মাঝবয়সি পুরুষ বলল, 'এখানে মেয়েরা একটু বড় হলেই ওদের কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়ত খাবে কী? অনেকেই তো গিয়েছে কাজ করতে। দিল্লি, কানপুরে কাজ।'

আমি আশ্চর্য হই। লোকটি বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের এখানে দুর্গা বহেন আছে। ও মাঝে মাঝেই ওদিকে যায়, তখন মেয়েদের নিয়ে যায়।'

—তোমরা ওর কাছে মেয়েদের ছেড়ে দাও? জিজ্ঞেস করি।

—হ্যাঁ, দেব না কেন? দুর্গা তো আমাদেরই লোক। লোকটি বলে, 'তবে ও এর জন্য কিছু পয়সা নেয়। মেয়েরা কাজ করে ভালই কামাই করে। বাড়িতে পয়সা পাঠায়। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে।'

এর মধ্যে একজন দুর্গাকে ডেকে আনে। মাঝবয়সি মোটাসোটা মহিলা। একটু ভাল কাপড় পরা। সে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করে। তারপর লোকটির কথার খেই ধরে বলে, 'ওরা আমাকে যখন বলে, আমি কনট্যাক্ট করিয়ে দিই। আমি আগে কানপুরে কাজ করতাম তো।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'এতে আপনার লাভ কী?'

দুর্গা হেসে বলে, 'লাভ তো ওই, কাজ পেলে ওদের খুশিমতো কিছু দেয়। কী করবে বলেন। বাগান তো বন্ধ। কামাই তো করতেই হবে। ওসব জায়গাতে ভাল পয়সা পায়।'

—সবাই কি বাংলার বাইরে যায়?

আমার প্রশ্নের উত্তরে দুর্গা বলে, 'কলকাতা সাইডেও কাজ পাওয়া যায়, তবে কম। পয়সাও কম। কী মনে পড়াতে যেন দুর্গা উঠে পড়ে। বলে, 'আমি যাই, কাজ আছে। দেখবেন, মেয়েটার যারা ক্ষতি করল, তাদের যেন শাস্তি হয়।'

আমরাও উঠে পড়ি। বাগান থেকে বার হতে হতে যে লোকটা আমাদের ঘটনাস্থল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, সে বলে, 'এরকম ঘটনা এলাকাতে কতই ঘটে। এই ব্যাপারটা নিয়ে দেখছি বেশি জানাজানি, হইচই হল।'

ভাবলাম, আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিই কোনও ঘটনা গুরুত্ব পাবে কি না বা কতটা গুরুত্ব পাবে তা ঠিক করে দেয়। সময়টা সেরকমই ছিল। তাই মেয়েটার কথা কিছুদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় জায়গা পেয়েছিল।

এমন কতই না কাহিনি আছে। সব একবারে বলার জায়গা এটা নয়। কিছুটা একঘেয়েমিও হয়ত লাগতে পারে। তবে শেষ করবার আগে একটা অন্যরকম ছোট অভিজ্ঞতার কথা বলি।

নাম ফাটার কিঞ্চিৎ মাশুল

বেশ কিছুকাল আগে, পুলিশ লক-আপে ভীষণভাবে অত্যাচারিত একজন মানুষ, যার জন্য আমরা কিছু লড়াই, কিছু ছোটাছুটি করবার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশে সে কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। হঠাৎ একদিন তার কাছ থেকে ফোন পেলাম, দেখা করতে চায়। আসতে বললাম। আমার স্কুল ছুটির পর বাস স্ট্যান্ডে দেখা করতে এল। নমস্কার করে আমার ও আমার পরিবার, তারপর সংগঠনের যাদের চিনত, সকলের কুশল জেনে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে অমুক তারিখে, আপনারা সকলে আসবেন কিন্তু।'

বললাম, 'বাঃ সুখবর, নিশ্চয় চেষ্টা করব।' মনে একটা তৃপ্তির অনুভূতিও হল।

এমন সময় সে বলল, 'সার, আমি তো গরিব মানুষ। আপনার কাছে একটা আর্জি আছে।'

মনে মনে এমন কিছুর জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। বললাম, 'বলো।'

সে বলল, 'আমার মেয়ের বিয়েতে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে।'

কিছু সাহায্য করতে হবে, সেটা জানতাম, কিন্তু এরকম দাবির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বাস্তবিক গরিব লোক। দিনমজুরি করে। যে সময় তদন্তের প্রয়োজনে তাকে হাজিরা দিতে হত, প্রতিদিন দুপুরে খাওয়া আর ক্ষতি হয়ে যাওয়া হাজিরা বাবদ কিছু টাকা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছি। এখন এই দাবিতে সে জন্য আমি একটু বিরক্ত হলাম। বললাম, 'ওভাবে বলছ কেন? দেব, যেটা আমি পারব, দেব। কিন্তু তুমি ওভাবে পরিমাণ বলে চাইতে পারো না।'

লোকটা হাসল, হাত কচলাল। তারপর বলল, 'এটা তো সামান্যই চাইছি সার, আমার কেসটা করে আপনার যে নাম ফাটল, কাগজে আপনার নামে খবর হল, তার তুলনায় এটুকু তো করতেই হবে আপনাকে।'

জাতীশ্বর ভারতী

নতুন বছরে পুরবাসীকে উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

নতুন বছরের কর্মসূচি—

- মাথাভাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানান শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরের ১২টি ওয়ার্ডে এলইডি পথবাতি লাগানো হবে, বরাদ্দ ৯০ লক্ষ টাকা।
- নগরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই প্রথম একজন স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। শহরের তিনটি সাব-সেন্টারে সপ্তাহে একদিন করে এবং পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে রোগি দেখবেন ডাক্তার অভিজিৎ সিনহা।
- এ ছাড়াও একজন স্যানিটারি ইনস্পেক্টর এবং একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- পৌরসভার ৭, ৮ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার ও নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হবে।
- 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে ৬৩টি পাকা ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া 'আরবান পুওর' প্রকল্পে ২৪টি ঘর নির্মাণ করে প্রাপকদের প্রদান করা হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। খরচ হবে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

যেসব প্রকল্প চলছে—

- নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার সার্ভের কাজ করে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।
- শীঘ্রই শুরু হবে মাথাভাঙা বাজারের আধুনিকীকরণের কাজ। ৬ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার।
- বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।
- চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।
- ঐতিহ্যবাহী নৃপেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাগার সংস্কারের কাজ চলছে।
- মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- প্রাচীন শিব মন্দিরের সংস্কারের কাজ পুরোদমে চলছে।
- অর্ধসমাপ্ত আশুতোষ হলের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।
- মাথাভাঙার নিকাশী ব্যবস্থা সুসংহত করতে মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়।
- শহরের রাস্তা ও নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে সারা বছরই।

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল লাইব্রেরির সংস্কারের কাজ চলছে

শহরের প্রাচীন শিব মন্দির সংস্কারের কাজ চলছে

- বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।
- দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নে ভেঙে পড়া পৌর-ব্যবস্থাকে সীমিত সামর্থের মধ্যে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাথাভাঙা পৌরসভা।

চন্দন কুমার দাস
ভাইস চেয়ারম্যান,
মাথাভাঙা পৌরসভা

লক্ষপতি প্রামাণিক
চেয়ারম্যান
মাথাভাঙা পৌরসভা

বয়সকালে বাত শীতে আরও কাত?

শীতের কামড়ে সবচেয়ে বেশি কাবু হন বয়স্ক মানুষ আর যাঁদের হাড় কমজোরি। কীভাবে তাঁরাও একটু ভাল থাকবেন; পরামর্শ দিলেন **ডাঃ পার্থপ্রতিম পান**, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান; ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ।

বয়স হলেই সময়ের নানা ফন্দি আমাদের শরীরকে কাবু করে দেয়। হাঁটুর বাড় তো আছেই, যাতে হাঁটুর ভিতরের পুষ্টিকারক রস বা লাইনোভিয়াল ফ্লুয়িড শুকিয়ে যায় আর কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি ক্ষয় হতে হতে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়, ফোলা হয়। আছে অস্টিয়োপোরোসিস— বয়স্ক মানুষের হাড়ের ঘনত্ব প্রতি বছর দু'থেকে তিন শতাংশ করে কমতে থাকে, হাড় কমজোরি আর ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ক্ষয়জনিত কারণেই হয় কোমর ও ঘাড়ের স্পন্ডিলাইসিস, তার থেকে ব্যথা, টান লাগা, মাথা ঘোরা, হাত-পায়ে ঝিনঝিন— এইসব সমস্যা। তা ছাড়াও রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাতের মতো বড় ধরনের বাতও বয়স্ক মানুষকে বিছানায় ফেলে দিতে পারে।

শীতকালের ঠান্ডায় ব্যথা বাড়ে বিশেষত বাতের ব্যথা। বাংলা প্রবাদ বচনেও বলে সেকথা। আধুনিক এই গতির যুগেও সেকথা হেলায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, ঠান্ডায় আমাদের মাংসপেশি এবং অস্থিসন্ধিগুলির জড়ত্বের কারণে সহজেই টান লাগে, ব্যথা বাড়ে। তাই এই শীতে বিশেষ করে পৌষ-মাঘের ঠান্ডার দিনগুলিতে বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামশ হিসেবেই বলব, তাঁরা যেন ঠান্ডা না লাগান, গরম জামাকাপড় পরেন, গরম জলে স্নান করেন আর অতি অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খান।

নিয়মিত দুধ (সর ছাড়া) আর ছোট মাছ হাড়ের ক্যালশিয়াম ঠিক রাখতে সাহায্য করে। খাদ্যের তালিকায় এই দুটি খাদ্য নিয়মিত রাখা গেলে ফল পাওয়া যাবে। এই সময় প্রচুর সবজি খান। শুগার, প্রেশার বা হার্টের অসুখ, যেগুলো বয়স্কদের নিত্যসঙ্গী, তাতেও এইসব খাবার সাধারণত নিরাপদ।

নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মর্নিং ওয়াক ভোর পাঁচটায় করতে হবে এমন কোনও দিব্যি নেই। একটু রোদ উঠলে তবেই বেরন। এমনকি বিকেলেও হাঁটতে পারেন। আর প্রতিটি অস্থিসন্ধির নিয়মিত ব্যায়াম খুব জরুরি। আর্থ্রাইটিস, স্পন্ডিলাইসিস বা ডিস্কের সমস্যা থাকলে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে নির্দিষ্ট ব্যায়াম জেনে নিন এবং নিয়মিত ঘড়ি ধরে অন্তত আধ ঘণ্টা করুন। পারলে দু'বেলাই করুন। ঝুঁকে কাজ, ঘাড় কাত করে টিভি দেখা, ভারী ওজন তোলা, হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে কাজ করা, বেশি সিঁড়ি ওঠানামা বন্ধ করুন। কমোড থাকলে সেটাই ব্যবহার করা ভাল। কিডনিতে স্টোনের ইতিহাস না থাকলে নিয়মিত ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া ভাল। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো ভিটামিন ডি খাবেন। স্নানের আগে অন্তত পনেরো মিনিট শরীরে রোদ্দুর লাগালে চামড়ায় ভিটামিন ডি-র সংশ্লেষ হয়, যা হাড় এবং শরীরের অন্য কাজেও লাগে। আর শীতের রোদ্দুর তো মিষ্টি লাগবেই— গা এলিয়ে বই পড়ুন। প্রিয় শিল্পীর গান শুনুন বা নাতিনাতনিদের পুরানো দিনের গল্প বলুন।

অনলাইন কেনাকাটা

নিরাপত্তার টুকিটাকি

মেয়েরা আর আবদ্ধ নেই অন্দরমহলে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ এখন বিহঙ্গের মতো। ঘর-সংসার সামলে তাকে পা রাখতে হয় কর্পোরেট দুনিয়ায়। শুধু তা-ই নয়, গ্রামগঞ্জের চেহারাটাও আজকাল আর ঠিক আগেকার মতো নেই। ই-দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত সকলেই। এই ইলেকট্রনিক্সের বৃহৎ পরিসরের অনেকটাই আমাদের অজানা। অথচ জানার আগ্রহ সকলেরই। আমাদের এ আগ্রহ মেটাতেই হাজির হয়েছেন ইন্দ্রনীল দত্ত তাঁর তথ্যের ভাণ্ডার নিয়ে। দেখা যাক, আমাদের যদি কাজে লাগে।

গত আর্থিক বছরে প্রায় ৪ কোটি ভারতীয় অনলাইন কেনাকাটা করেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে গড়ে ৬ হাজার টাকার পণ্য কিনেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে গত আর্থিক বছরে ভারতে অনলাইন শপিং স্টোরগুলি ২৪ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। অঙ্কটা নিঃসন্দেহে চমকে দেওয়ার মতো। এই ট্রেন্ড যদি বজায় থাকে, তবে চলতি আর্থিক বছরে ৬.৫ কোটি ভারতীয় অনলাইন কেনাকাটা করবেন এবং ব্যবসার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা। অনলাইন অনেক কম দামে পছন্দের ব্র্যান্ডের পণ্য কেনা যায়, দোকানে না গিয়ে বাড়িতে বসেই ফ্রি ডেলিভারি পাওয়া যায়— এগুলি অবশ্যই বাড়তি সুবিধা। কিন্তু একই সঙ্গে অনলাইন দাম মেটানোর ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত, না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কী কী সতর্কতা আমাদের নেওয়া উচিত?

অনলাইন স্টোরগুলি থেকে বিভিন্ন পণ্যের উপর বিশেষ ছাড়ের খবর জানিয়ে প্রায়ই ক্রেতাদের ই-মেল পাঠানো হয়। এই সমস্ত মেলে যে লিঙ্ক থাকে, কখনওই সেই লিংকে সরাসরি ক্লিক করবেন না। তার বদলে লিঙ্কটি কপি-পেস্ট করে

এন্টার প্রেস করুন। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের মেল অনলাইন স্টোরগুলির নাম করে হ্যাকাররা পাঠায়। হ্যাকারদের পাঠানো এই মেলগুলিকে বলা হয় ফিশিং মেল। ফিশিং মেলের কোনও লিঙ্কে সরাসরি ক্লিক করলে আপনার মেল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

অনলাইন কেনাকাটায় ডেবিট কার্ডের বদলে যতটা সম্ভব ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করুন। অনলাইনে কেনাকাটার সময় যদি কেউ জালিয়াতি করে আপনার ক্রেডিট কার্ডের তথ্য হাতিয়ে তা ব্যবহার করে, সে ক্ষেত্রে জালিয়াতিরা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়ার আগে আপনি বেশ কিছুটা সময় পাবেন ব্যাঙ্ককে প্রতারণার বিষয়টি রিপোর্ট করার জন্য এবং অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া ঠেকাতে পারবেন। কিন্তু ডেবিট কার্ডে সেই সময় পাওয়া যায় না। কেউ যদি আপনার ডেবিট কার্ডের তথ্য ব্যবহার করে জালিয়াতি করে, সে ক্ষেত্রে জালিয়াতির

ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে। আপনি যখন বিষয়টি জানাবেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া হারিয়ে যাওয়া ক্রেডিট কার্ডের উপর অধিকাংশ ব্যাঙ্ক জিরো লায়াবিলিটির সুবিধা দেয়। অর্থাৎ আপনার ক্রেডিট কার্ড যদি হারিয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে আপনি ব্যাঙ্ককে বিষয়টি রিপোর্ট করার পর সেই কার্ড বা কার্ডের তথ্য ব্যবহার করে কেউ কিছু কেনাকাটা করলেও আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা যাবে না।

অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক হল ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড। যাঁরা অনলাইন কেনাকাটা করেন, তাঁদের অনেকেই জানেন না যে, ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা ব্যাঙ্কগুলি বিনামূল্যে দেয়। সাধারণ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মতো ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডেও থাকে ১৬ ডিজিটের নম্বর, ইস্যু ও এক্সপায়ারি ডেট এবং CVV (কার্ড ভেরিফিকেশন ভ্যালু) নম্বর। ব্যাঙ্ক ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে আপনার অরিজিনাল ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড কিংবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ভার্চুয়াল কার্ডের CVV নম্বর, ইস্যু ও এক্সপায়ারি ডেট-সহ অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে আপনার অরিজিনাল ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের তথ্যের কোনও মিল থাকে না, তাই অনলাইন শপিং-এর সময় ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে সেই কার্ডের তথ্য যদি হ্যাকাররা জেনেও যায়, তবু আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তারা টাকা সরাতে পারবে না। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের আরও একটি সুবিধা হল, এই কার্ডের মেয়াদ খুবই কম। মাত্র ২৪/৪৮ ঘণ্টা কার্যকরী থাকে এই কার্ড। তা ছাড়া এই কার্ডের মাধ্যমে আপনি লেনদেনের সীমাও নির্দিষ্ট করতে পারবেন। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের আরও একটি সিকিউরিটি হল, এই কার্ড ব্যবহার করে একবার কোনও পণ্য কেনার পর কার্ডটি অটোমেটিক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অর্থাৎ কার্ডটি আর ব্যবহার করা যায় না। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের জন্য ব্যাঙ্কের কাস্টমার কেয়ার এগজিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলুন।

যখন কোনও অনলাইন স্টোরের ওয়েবসাইটে যাবেন, প্রথমেই দেখে নেবেন ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে সাইটের URL-এর পাশে HTTPS লেখা রয়েছে কি না এবং লক বা তালার ছবি রয়েছে কি না। যদি না থাকে, তবে কখনওই সেই সাইট থেকে শপিং করবেন না।

অনলাইন শপিং করার সময় আমাদের কাছ থেকে সাধারণত চাওয়া হয় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড নম্বর, কার্ডে লেখা আমাদের পুরো নাম, CVV নম্বর, কার্ডের এক্সপায়ারি ডেট এবং শিপিং অ্যাড্রেস। যদি এই সমস্ত তথ্যের বাইরে অন্য কোনও তথ্য যেমন এটিএম পিন, নেট ব্যাঙ্কিং লগ ইন আইডি, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি জানতে চাওয়া হয়, তবে সেই সমস্ত তথ্য দেবেন না এবং সেই সাইট থেকে কিছু কিনবেন না।

শেষে বলি, অনলাইন শপিং করার সময় কখনওই পাবলিক WiFi নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ক্যাফের কম্পিউটার ব্যবহার করবেন না। কারণ ক্যাফের কম্পিউটার এবং পাবলিক WiFi নেটওয়ার্কের কোনও সুরক্ষা নেই। নিজের বাড়ির কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে অনলাইন শপিং করুন এবং সেই ডিভাইসের সুরক্ষার জন্য অবশ্যই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করবেন।

তক্কাতক্কি

'প্রেম' নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ কি শুধুই শরীরসর্বস্ব একটি খেলা, যেখানে মনের স্থান থাকতেও পারে, না-ও পারে, নাকি মনের বীণার তারেই বাজে প্রেমের প্রথম ঝংকার, যার কম্পন বিস্তৃত হয় শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে? আপনার মতামত জানান। অনধিক ২০০ শব্দে আমাদের লিখে পাঠান আপনার নাম-ঠিকানাসহ এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে এখন ডুয়ার্স, মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১।**

মেঘ পিয়োন

মনের ভিতর এমন অনেক কথা জমে উঠছে, যা আপনি কাউকে বলতে পারছেন না। এমনকি বলতে না পেরে কোনও কাজে মন দিতে পারছেন না, অস্থিরতা বাড়ছে। এমন যদি হয়, আমাদের কাছে অনায়াসে শেয়ার করুন। প্রয়োজনে নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে, তাও গোপন রাখা হবে। লেখাটি যেন ২০০ শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পাঠান এই ঠিকানায়—

'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে এখন ডুয়ার্স, মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১।

ডুয়ার্সের ডিশ

আজকাল আর রান্না বলি না, বলি 'ডিশ'। 'রন্ধন প্রণালী' না বলে বলি 'রেসিপি'। 'উপকরণ' হয়ে গিয়েছে 'ইনগ্রেডিয়েন্টস'। হলে কী হবে, আমরা বাঙালিরা বাঙালিত্ব ছেড়ে বেরতে পারব কোনও দিন? পারব না। তবে সেসব দিনের রান্না আর খাই কই? ইংরেজিয়ানার চক্করে সব কিছুই কেমন ভজঘট। তাই ঠাকুমাকে মিস করি আমরা। ঘুঁটে আর গুল দিয়ে উনুন জ্বালাতেন সক্কালবেলা। সূর্যের প্রথম রোদ্দুরের আভা ফুটতে না ফুটতেই সেখানে প্রথম বসত চায়ের কেটলি। হারিয়ে যাওয়া ঠাম্মার হেঁশেল থেকে প্রায় ভুলতে বসা একটা পদের সঙ্গে রাজবংশীদের একটি দুর্দান্ত ডিশ পরিবেশিত হল।

লাউ-শুক্তো

উপকরণ: লাউ ১টা ছোট, মটর ডাল ১ কাপ, দুধ আধ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, সরষে ১/২ চা-চামচ, কালো জিরে ১/৪ চা-চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ৪টি, নুন স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, তেল প্রয়োজমতো।

প্রণালী: প্রথমে লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে পাতলা ও লম্বা করে কেটে রাখুন। মটর ডাল আগের দিন রাতে ভিজিয়ে পরদিন মিহি করে বেটে নিন। ১ চা-চামচ ডাল বাটা আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। বাকি ডাল বাটায় স্বাদমতো নুন ও কালো জিরে মিশিয়ে তেলে ভেজে ছোট ছোট বড়া তৈরি করে ফেলুন। এবার কড়াইতে এক চামচ তেল দিয়ে তাতে একে একে সরষে, আদা বাটা এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন। এবার কেটে রাখা লাউ কড়াইতে ছেড়ে দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে লাউ সেদ্ধ করে নিন। লাউ সেদ্ধ হয়ে গেলে ডালের বড়াগুলো ছেড়ে দিন। ১ কাপ দুধে আগে থেকে সরিয়ে রাখা মটর ডাল বাটা গুলে নিন। এই মিশ্রণটি কড়াইতে দিন, তার সঙ্গে ১ চামচ ঘি ও স্বাদমতো চিনিও দিয়ে দিন। এবার হাতা দিয়ে সব কিছু ভালভাবে মিশিয়ে ফেলুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

এই পদটি লিখে পাঠিয়েছেন কোচবিহার থেকে **রত্না গোস্বামী**।

হাঁস বাঁশ

'মাংস' রাজবংশী সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় আইটেম। তাঁদের ভাষায় মাংস হল 'মওসম' বা 'মসম'। উৎসবের রান্নায় 'মসম ভাত' না থাকলে গোটা আনন্দটাই নিরামিষ হয়ে যায় তাঁদের কাছে। তাই মাছের সীমা ছাড়িয়ে এবার হাঁসের মাংস বাঁশের টুকরো দিয়ে রান্না করার পালা। এখানে জানিয়ে রাখি যে, ডুয়ার্সের কচি বাঁশের ডগা রান্নার উপাদান হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। খুব ভাল হয় যদি অঙ্কুরিত বাঁশের মাথায় একটা ছোট ঘট উলটো করে বসিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়া যায়। এতে বাঁশ বেচারা ঘটের মধ্যে বড় হয়ে বাঁধা কপির আকার ধারণ করে। সেই কপি কুচিয়ে নিলে ব্যাপারটা মোক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের হাতে তেমন সময় ছিল না বলে কচি বাঁশের ডগা ছোট ছোট করে কিঞ্চিৎ সেদ্ধ করা হয়েছিল। ইচ্ছে করলে সেই ডগা কুচিয়ে নিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। সোজা কথায় আপনার বাঁশ আপনি কীভাবে খাবেন তা আপনার ব্যাপার।

উপকরণ: আড়াই কেজির একটা হাঁস। বাঁশের টুকরো বা কুচি ২৫০-৩০০ গ্রাম। টমেটো আর পেঁয়াজ তিনটে করে। আদা বাটা তিন চামচ। রসুন বাটা দু'চামচ। হলুদ-লবণ-গরম মশলা-জিরে গুঁড়ো পরিমাণ মতো। বাদাম বাটা আর সরষে বাটা অল্প আর তেল ও লংকা। এছাড়াও একটু গুঁড়ো দুধ আর অল্প পাঁচ ফোড়ন।

প্রণালী: হাঁস ভাল করে পালক আর চামড়া ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিন। এক পরমাণু রোম যেন না থাকে। তারপর মাংস টুকরো করে ভাল করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে কুচোনো পেঁয়াজ দিয়ে

নেড়ে-চেড়ে নরম করে পর পর ঢালতে থাকুন আদা-রসুন-বাদাম-সরষে বাটা। মশলা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলে হলুদ-লংকা-জিরে-গরম মশলা দিয়ে কষাতে থাকুন। কষানো হয়ে গিয়েছে মনে হলে একটু জল দিয়ে হাঁসের টুকরোগুলো ছেড়ে দিন। অপেক্ষা করুন সেদ্ধ হওয়ার জন্য। মাংস সেদ্ধ হয়েছে মনে হলে এতে বাঁশের কুচি বা টুকরো দিন। সঙ্গে কয়েকটা কাঁচা লংকা। এবার আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর সুবাস বেরতে শুরু করলে বুঝবেন 'হাঁস বাঁশ' রেডি।

নামানোর আগে কেউ কেউ এক চামচ গুঁড়ো দুধের সঙ্গে একটু পাঁচ ফোড়ন জলে গুলে কড়াইতে ঢেলে দিয়ে আধ মিনিট রেখে নামিয়ে নেয়। আমাদের রাঁধুনি অবশ্য সেটা করেননি। আপনি ইচ্ছে করলে করতেই পারেন। এবার গরম ভাতের সঙ্গে মেখে মুখে দিন তো! ইল্লুস! তাই না? এই জন্যই বলে রাখি যে পাখির মাংসের মধ্যে সেরা হলেন হংস। সোনায় সোহাগা হয় যদি মেশে বংশ।

স্মর্তব্য: হাঁস ছাড়ানো খুব মন দিয়ে করা উচিত। এটা প্রায় একটা আর্ট। বাঁশের কপি বানাতে পারলে স্বাদ আরও জম্পেশ হবে। বাঁশের টুকরো আগেই একটু সেদ্ধ করে নিলে ভাল হয়। আর হাঁসের মাংস একটু গরম খাদ্য— এটা মনে রাখা জরুরি।

এই পদটি লিখে পাঠিয়েছেন চূড়াভাণ্ডার থেকে **কানন রায়**।

আপনিও যদি রাঁধতে এবং খাওয়াতে ভালবাসেন তাহলে আপনার রেসিপির ছবিসহ বিবরণ পাঠান আমাদের ঠিকানায়। সেইসঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং, ছবি ইত্যাদি পাঠাতে ভুলবেন না।

শ্রীমতী ডুয়ার্স, প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স'। মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১ কিংবা ই-মেল করুন ekhonduars@yahoo.com

ডুয়ার্স চত্বরের সাবেকি রান্না এই ক্ষেত্রে প্রকাশে অগ্রাধিকার পাবে।

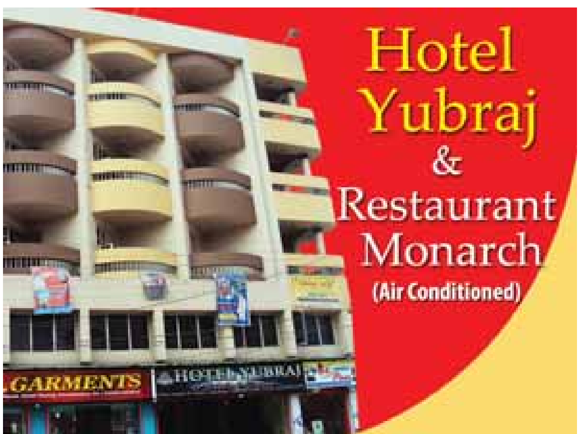

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

এখন ডুয়ার্স নিয়মিত পাচ্ছেন তো?

গত এক বছর **এখন ডুয়ার্স** নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেক মাসের গোড়াতে। **এখন ডুয়ার্স** পাঠকদের অনুরোধ জানাই গত বারোটি সংখ্যা আপনার হাতে এসেছে কি না একবার মিলিয়ে নিন। পত্রিকা নিয়মিত না পেলে বা কোথায় নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে, ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করবেন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে। শুরু হয়েছে বইমেলার মরশুম। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বইমেলায় হাজির থাকব আমরাও। **এখন ডুয়ার্স** স্টলে আপনাদের আগাম আমন্ত্রণ রইল।

এখন ডুয়ার্স
পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসংখ্যা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

শ্রীমতী ডুয়ার্স

পাঁক থেকে তুলে আনা কুঁড়ি যেখানে ফুল হয়ে ফোটে

একটি কন্যাশিশু জন্মগ্রহণের সময় থেকে অথবা গর্ভে থাকা অবস্থা থেকেই যদি বাবা-মায়ের চক্ষুশূল হয়ে পড়ে, তার জীবনে এর চাইতে কষ্টের কি আর কিছু হয়! আমরা ভাবি না। অথবা বাবা-মায়ের অন্তরের নয়নমণিটি যদি অন্য কারও দ্বারা যৌন অত্যাচারের শিকার হয় তাহলে বাবা-মায়ের কাছে কি সান্ত্বনা থাকে! কিন্তু 'অনুভব' একটি এমন ঠিকানা, যেখানে নিরাপত্তা আর ভালবাসার ঘেরাটোপে আগলে রাখা হয় আঠারো-অনূর্ধ্ব হারিয়ে পাওয়া কন্যাসন্তানদের।

দীপশ্রী রায়ের কাছ থেকে ওদের কাহিনি শুনতে শুনতে গলা ধরে আসছিল বারবার। মেয়েটির বয়স তখন বছর দশেক হবে। ডুয়ার্স এলাকার মধ্যে দিয়ে ট্রেনে যেতে যেতে বাথরুমে যায় তৃষা (নাম পরিবর্তিত)। বাবা তাকে বাইরে রেখে আটকে দিয়ে নেমে যায় ট্রেন থেকে। প্রাণে মেরে ফেলতে পারেনি বলেই হয়তো ত্যাগ করার এ নতুন পদ্ধতি। পুলিশের মাধ্যমে ঠিকানা হল জলপাইগুড়ির 'অনুভব' হোম।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পিতার ঘরে একমাত্র কন্যা পূর্বা (নাম পরিবর্তন)। মা আত্মহত্যা করে। বাবা তখন সংশোধনাগারে অনুরোধ করে, তার মেয়েটিকে যেন কোনও 'হোম'-এ দিয়ে দেওয়া হয়। 'অনুভব' তখন গড়ে ওঠার মুখে। লাইসেন্স হাতে পাওয়া হয়ে গেছে। জয়ন্তিপাড়ায় একটি ভাড়া ঘরে শুরু হল জলপাইগুড়িতে নাবালিকাদের জন্য প্রথম হোম। ছেলেদের জন্য 'কোরক' তো ছিলই আগে থেকে। ২০০৬-এ প্রথম মেয়ে হিসেবে যখন পূর্বা এল, তখন তার বয়স মাত্র ছ'বছর। 'অনুভব' পরিবারের আদরে বেড়ে উঠে আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে সে। উত্তরবঙ্গে একমাত্র কোচবিহারেই ছিল মেয়েদের জন্য হোমের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় এই জলপাইগুড়ির 'অনুভব', পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট ছোট কন্যার নতুন ঠিকানা। কীভাবে তিলে তিলে তা গড়ে উঠল, ছোট্ট করে জানাতে ইচ্ছে করছে সকলকে।

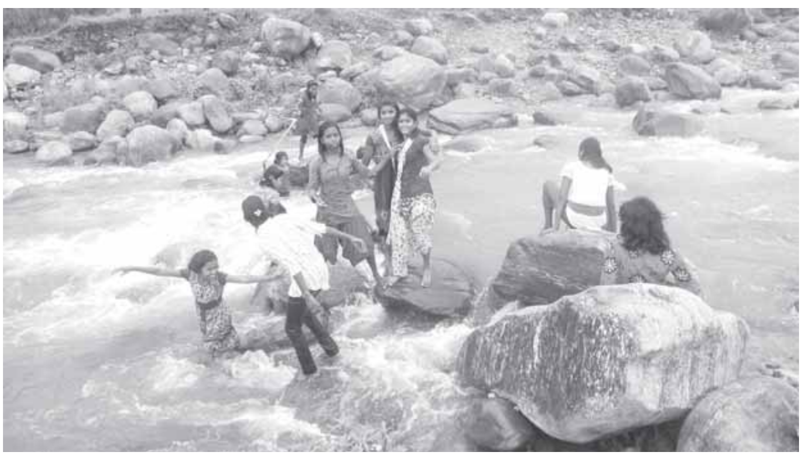

পারিবারিক বোঝাপড়ায় যখন তীব্র গোলমাল দেখা দেয়, তখন কারও শরণাপন্ন হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তা মিটিয়ে নেওয়া যায়। এই 'কারও' বা এই 'কেউ'-এর কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন জলপাইগুড়ি মহিলা-কল্যাণ সংঘর হয়ে সকলের শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা বাগচি (বর্তমানে প্রয়াত)। দীপশ্রী তাঁরই ঘরের বউ হয়ে এসে যুক্ত হয়ে যান এই ধরনের নানান সামাজিক উত্তরণের কাছে। মহিলা-কল্যাণ সংঘ তৈরি করার পরিকল্পনা শুরু হয় সেই ১৯৮২ সাল থেকে। অবশেষে তা পরিপূর্ণভাবে কাজ শুরু করে ১৯৯২-তে। এ কাজ করতে গিয়ে একটা সময় দেখা যেতে লাগল, প্রচুর সংখ্যায় ৪৯৮ মামলা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায়। মহিলা-কল্যাণ সংঘর সঙ্গে পুলিশের কপালেও ভাঁজ। থানায় খোলা হল নতুন কাউন্সেলিং সেন্টার এবং যাতে এ ধরনের ঘটনা কমে, তার দিকেও নজর দেওয়া হল। তার কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল যে, ৪৯৮ করার পর আপশোস হচ্ছে মহিলার। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। তাই তাদের মিলিয়ে দেওয়া নানারকম বন্দোবস্ত করার কাজ শুরু হল থানার সেই নতুন সেন্টারে, যার নাম দেওয়া হল 'বন্ধন'। এতে যুক্ত হলেন কাউন্সিলর, উকিল, একজন সাইকোলজিস্ট এবং একজন সাইকোথেরাপিস্ট। এঁদের মধ্যে ছিলেন দীপশ্রী রায়, গৌরী চৌধুরী, পূর্ণপ্রভা বর্মন, ছন্দবীথি কুণ্ডা, মিতা সান্যাল, কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জি, প্রতিমা বাগচি, গীতা মুখার্জি ও শিপ্রা সেনগুপ্ত। এই কাজ চলতে চলতে ২০০০ সালের গোড়া নাগাদ, যে সময় চা-বাগানগুলো বন্ধ হতে শুরু করছে, সে সময় দেখা যেতে লাগল কলকাতা, দিল্লি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট হারিয়ে যাওয়া মেয়ের উদ্ধারের খবর আসতে লাগল। মেয়েরা সবই আমাদের ডুয়ার্সের। প্রশাসনিক তৎপরতায় তাদের নিয়ে আসা হতে লাগল জলপাইগুড়ি থানায়। তারপর বন্ধন ও পুলিশের ঐকান্তিক সৎ প্রচেষ্টায় তাদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পৌঁছে দিয়ে আসা হতে লাগল। একবার হল কী, এভাবেই একজনকে পৌঁছাতে গিয়ে দেখা গেল, তার বাড়ির অত্যন্ত করুণ পরিস্থিতি। এত দারিদ্র্য যে তার মা নিজের প্রতিদিনের খাবারটুকুও জোটাতে পারে না ঠিকঠাক। মেয়েটিকে ওখানে রাখলে যে সে আবার পাচার হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যেন কোনও সন্দেহের অবকাশই রইল না। মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল সকলের। যেহেতু কোনও

পরিকাঠামো নেই, মনের অবস্থা সকলেরই খুব বিষণ্ণ। ছেলে হলে 'কোরক'-এ রাখার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু মেয়ে তো। কিছু করা গেল না সে যাত্রায়। কিন্তু নতুন ভাবনায় বীজ প্রোথিত হল সকলের মনেই। অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল কন্যাসন্তানদের জন্য একটি হোমের। 'অনুভব'-এর সূত্রপাত এভাবেই। ২০০৫-এর ১৪ নভেম্বর, শিশু দিবসের দিন, পুরোদস্তুর চালু হয়ে গেল 'অনুভব' হোম।

অনুভবের এখনকার ছবিটা দেখলে মনে হয়, পিছনের যুদ্ধটা সার্থক। এত একনিষ্ঠ ভাবনা, এতটাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে তা সাফল্যমণ্ডিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তা কি বৃথা যেতে পারে কখনও! প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর একসঙ্গে সকলের জন্মদিন পালন করা হয়ে আসছে। দু'-এক বছর থেকে এ দিনটি পালন করা হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। সেই বিশেষ দিনটিতে যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের নেমন্তন্ন করা হয় এবং সক্কলকে পায়েস খাওয়ানো হয়। আজকাল আবার বিভিন্ন দোকান থেকে কেকও আসে উপহার হিসেবে। যাঁরাই সে দিন আসেন, তাঁদের সকলের জন্যই থাকে রিটার্ন গিফ্‌টের ব্যবস্থা। বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, বিভিন্ন বিশেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন— এসব তো আছেই। সেই সঙ্গে চলছে পড়াশোনাও। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু এক্সট্রাকারিকুলামের সন্ধান পেয়েছেন দিদিরা। ছোট্ট ছোট্ট প্রতিভা লুকিয়ে আছে খুদেগুলোর মধ্যে। বড়দের চোখ এড়ায়নি। সেই অনুযায়ী চলছে তাদের প্রতি যত্ন। কারও গানের গলা ভাল, কেউ বা হাতের কাজে পটু, কারও আছে নাচের প্রতিভা, কেউ বা নাটক করতে পারে। 'চিত্তপট' জলপাইগুড়ির একটি নাট্যসংস্থা, যাদের ছোটদের নাটক শেখানোর একটি শাখা আছে। এখানে নাটক শিখছে এবং ভাল অভিনয় করছে এমন উদাহরণও আছে 'অনুভব'-এর অন্দরে। পার্লারের কাজ শিখিয়ে নিজের পার্লার খুলে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা হয়েছে হোমের কন্যাকে। দু'জন পড়ছে Eye Nursing। এখন শিলিগুড়িতে তারাও কর্মরত। তাই-কোন-ডু শিখছে অনেকেই। জেলাস্তর ছাড়িয়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় গেছে ৭/৮ জন। তারই মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে গেছে জাতীয় স্তরে।

এখানে কেউ কারও শিক্ষক নন, কেউ কারও ছাত্রী নয়। সকলেই ওদের দাদা-দিদি, এমনকি মাসি-কাকু— এইসবই। তবেই তো ওরা ভাবতে শিখেছে, এটাই আমাদের পরিবার, এঁরাই আমাদের আত্মীয়। সর্বোপরি বলা যায়, 'অনুভব' জলপাইগুড়ির একটি আদরের সংস্থা, যাকে সক্কলে অনুভব করে তাদের অন্তরাত্মার অন্দরমহল থেকে।

শ্বেতা সরখেল

ডুয়ার্সের মুখ

এক নাট্যসাধকের উপাখ্যান

নাট্যচর্চারও আধ্যাত্মিকতা আছে। সেই আত্মিক চিন্তা বা সাধনা নাটকের আত্মাসম্বন্ধীয়। জলপাইগুড়ি শহরের সাধন চক্রবর্তী সেই নাট্যব্রতী। ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গে বোধহয় তিনিই একমাত্র, প্রচারের আলোকবৃত্ত থেকে দূরে থেকেও নাট্যসৃজন ও শিল্পের সম্পর্কগুলির মধ্যে সন্ধি বা সমন্বয়ের সন্ধান করে চলেছেন যিনি। আজন্ম নাট্যসাধক সাধন একান্তভাবেই ডুয়ার্সের মানুষ। আশৈশব তাঁর ঠিকানা জলপাইগুড়ি শহর।

এ পর্যন্ত ১৫০টিরও বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ করতে হয়— মুক্তি, ত্রিংশ শতাব্দী, আজও চিত্রাঙ্গদা, জেহাদ, স্বপ্নের সারথি, রস, নৈশভোজ, দুই হুজুরের গপ্পো, আমি মদন বলছি। অভিনয় দক্ষতা সব ক'টিতেই স্পষ্ট। মঞ্চাভিনয় ছাড়াও ভিন্ন মাত্রা রেখেছিলেন নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রে। নাট্যশিল্পের এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন নিজেকে। এইভাবে বিভিন্ন নাট্যদল ও সংগঠনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি নাটক প্রযোজনা নির্দেশনা করেছেন সাধনবাবু। একই সঙ্গে সেইসব নাটকে অভিনয়ও করেছেন।

১৯৭৮ সালে মুখোশ নাট্যদলে কাজ করার সময় বারবারই ব্যাহত হচ্ছিল তাঁর মনঃসংযোগ। আসলে নাট্যরূপ বা সেই নাট্য-ভাষায় তাঁর মন ভরছিল না কিছুতেই। এক কথায়, উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করছিলেন ভীষণভাবে। সেই তাড়না থেকেই 'ডাইনি' নাটক। একে একে নাট্যরূপ দিলেন 'আজও চিত্রাঙ্গদা', 'জেহাদ', 'জিরো পয়েন্ট', 'স্ত্রীর পত্র'। অন্তত ২৫টিরও বেশি নাট্যরূপ করেছেন বিভিন্ন রচনা অবলম্বনে বা প্রেরণায়। এ ছাড়াও ২০টিরও বেশি স্ট্রিট ড্রামার স্ক্রিপ্ট রচনা করেছেন এবং তাতে অভিনয় করেছেন এই নাট্যশিল্পসাধক। এক তীক্ষ্ণ অলোকময়তায় নাট্যকলার প্রতিটি শাখাপ্রশাখাকে যেন একের পর এক অনুধ্যান করে চলেছেন তিনি। জেলবন্দিদের নিয়ে তৈরি করেছেন 'রথের রশি' ও 'অন্তরাল'।

আর্থিক সংকট কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে কোনও শিল্পীর শিল্পসাধনাতেই ব্যাঘাত ঘটায়। সংখ্যায় বিরল হলেও সাধন চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন। চূড়ান্ত অনটন যখন তাঁর সংসার কুরে কুরে খাচ্ছে, তখনও নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি নাট্যসাধনা থেকে।

স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন 'দিশারি' পুরস্কার। পেয়েছেন সর্বভারতীয় স্তরে দু'বার শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অভিনেতার পুরস্কার; সারা বাংলা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকারের পুরস্কার। এ ছাড়া সম্মানিত হয়েছেন বিভিন্ন সংগঠন থেকে। উত্তরবঙ্গের এক মফস্‌সল শহরে প্রোথিত যাঁর শেকড়, সেই তিনি কীভাবে অস্বীকার করবেন উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে? ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতিকে বিশ্ব-দরবারে উপস্থাপিত করবার ভাবনা নিশ্চয়ই তাঁর অন্তরে ছিল। তাই 'মাসান' নিয়ে কাজ শুরু করেছেন সাধন চক্রবর্তী। মানব অস্তিত্বের পর্যবেক্ষণ ও অনুধ্যান থেকে যখন তিনি দেখতে পান উত্তরবঙ্গের মানুষজন অস্বীকার করছেন উত্তরের থিয়েটার ও নাট্যচর্চাকে, তখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় আক্ষেপ। নাটকের উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার পর যে নৈঃশব্দ্য, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন তথাকথিত আধুনিক সমাজবাস্তবের প্রচলিত প্রতিরূপ।

কোম্পানি থিয়েটার চালু হলেও ডুয়ার্সে প্রফেশনাল থিয়েটার সম্ভব হয়নি এখনও। অদূর ভবিষ্যতেও সে আশা দেখা যাচ্ছে না। ডুয়ার্সের থিয়েটারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বারংবার প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর স্নায়বিক ও মানবিক অনুধ্যানে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জলপাইগুড়ির সব্যসাচী, তমোজিৎ, দীপংকর, মানস, কোচবিহারের দেবব্রত, দীপায়ন, শিলিগুড়ির ঋত্বিক, মুরারি, পার্থর মধ্যে তিনি খুঁজে পান ডুয়ার্সের নাট্যশিল্পের ভবিষ্যৎ। কালিয়াগঞ্জের অনন্যা থিয়েটার, বিচিত্রা, বালুরঘাটের নাট্যদলগুলির নাটকের উৎকর্ষ নতুন আশার আলো দেখায় তাঁকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক সরল সুন্দর সমাজ উপহার দিতে, সৃজনশীলতার আলোকধারায় সুস্নাত হয়ে এক অভূতপূর্ব নির্লিপ্ততায় নাট্যসাধনা করে চলেছেন সাধন চক্রবর্তী।

সীমা চৌধুরী

রংরুটের যে বইগুলি এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

অন লাইনে প্রাপ্তিস্থান www.boimela.in

পশ্চিমবাংলার ৩৬০ প্রজাতির পাখির সচিত্র বিবরণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। ৫০০ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া রঙিন। বিদেশি আর্ট পেপারে ছাপা। মূল্য ১০০০ টাকা।

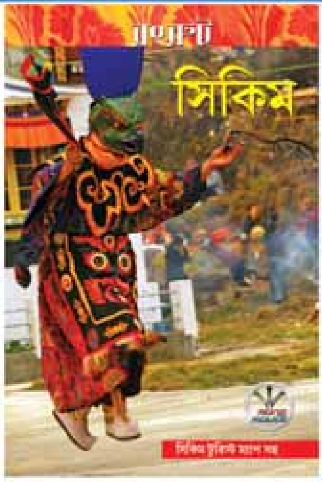

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য ২০০ টাকা

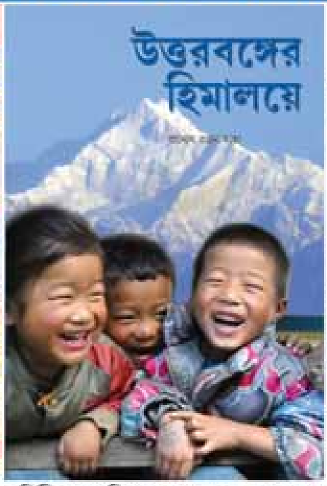

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

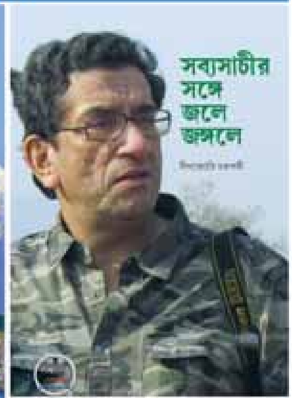

সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

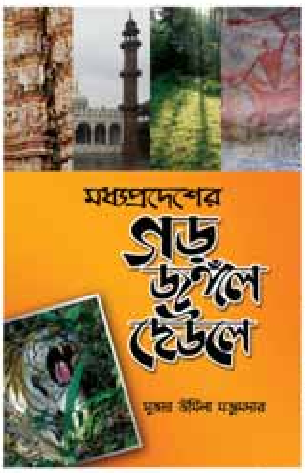

মধ্যপ্রদেশ বেড়াবার একমাত্র বাংলা গাইড
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার।
মূল্য ২০০ টাকা।

আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগে এই বই প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ১৫০ টাকা

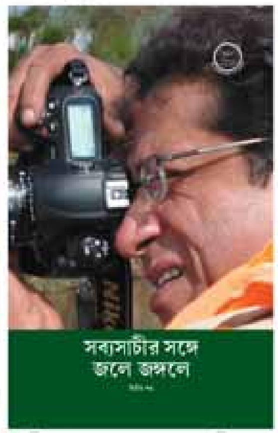

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের ও শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বইমেলায় আমরা থাকছি 'এখন ডুয়ার্স'-এর স্টলে। কলকাতা পুস্তক মেলায় আমাদের স্টল নম্বর ১৯৭

মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ১৫০ টাকা

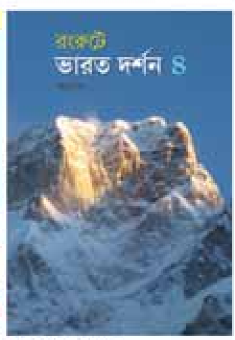

মূল্য ২০০ টাকা

মূল্য ৯০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে, বোলপুর শান্তিনিকেতন সুবর্ণরেখা, শিলিগুড়ি ইকনমি বুক স্টল কলেজ রোড, জলপাইগুড়ি ভবদার দোকান, কমার্স কলেজের উলটো দিকে কোচবিহার অ্যালফাবেট স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটো দিকে, আলিপুরদুয়ার ম্যাগাজিন সেন্টার কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.